

## নবম অধ্যায়

### মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, “২৫শে মার্চ দিনটি হবে সংকটজনক।” (দৈনিক বাংলা, ১৯৭৩)। অন্যদিকে পাকিস্তানী সামরিক জাত্তা অনেকদিন আগে থেকেই আলোচনা ভেসে গেলে শক্তির সাহায্যে বাংলাকে দমন করার একটি পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এর নাম দিয়েছিল তারা ‘অপারেশন সার্ট লাইট।’ অন্যদিকে আমরা এর নাম দিয়েছি ‘কালরাত্রি’।

২৫ মার্চ মধ্যরাত বা ২৬ মার্চ রাতটি হলো কালরাত্রি। বাংলাদের দমন করার জন্য ৩ ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ‘অপারেশন সার্টলাইট’ অংশগ্রহণ করে। রাত ১১টার দিকে অপারেশন শুরু হয়। এই অপারেশনের অর্থ গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ। ঐ দিন পুরো ঢাকা শহর আক্রান্ত হয়। বিশেষ লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে শিক্ষক ছাত্রদের হত্যা করে জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল বিভিন্ন জায়গায় গণকবর দেয়া হয়। সেই রাতে ৭ জন শিক্ষক শহীদ হয়েছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব। ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহরুল হক হল) ছিল কামানের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। শাখারি বাজার, উত্তিবাজার, নয়াবাজার পুড়িয়ে দেয়া হয়। সেদিন শুধু ঢাকা শহরে কতোজনকে হত্যা করা হয়েছিল তার হিসাব নেয়া যায়নি। কারণ, অনেক দেহ পুড়ে গিয়েছিল বা গণকবর দেয়া হয়েছিল। তবে, সে সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাজারের বেশি।

লক্ষন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ ৩১ মার্চ ১৯৭১ সালে এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ছাপে :

“আলাহ এবং পাকিস্তানের ঐক্যের নামে” ঢাকা আজ এক বিধ্বন্ত ও সন্তুষ্ট নগরী। দীর্ঘ ২৪ ঘণ্টার নৃশংস অভিযান, ঠাণ্ডা মাথায় বোমাবর্ষণ এবং গোলাগুলি চালিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কমপক্ষে সাত হাজার মানুষ হত্যা করেছে। তারা বিশাল এলাকা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্পৃহা শুরুতেই স্তুক হয়ে যায়।... হাজার হাজার মানুষ আমের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। শহরের রাস্তাঘাটগুলি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে এবং প্রদেশটির নানা জায়গা থেকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের খবর আসছে। ...সেনাবাহিনী গুলি করে মারছে সাধারণ মানুষকে এবং দালান-কোঠা গুড়িয়ে দিচ্ছে নির্বিচারভাবে।

...সেনাবাহিনীর এই বর্বর অভিযানকে আন্দাজ করা যাবে বিছানাতে ছাত্রদের রক্তাঙ্গ মৃতদেহ দেখে, ভশ্যভূত ঘর-বাড়িতে আগনে পোড়া নারী ও শিশুর দেহ দেখে। পাকিস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকজনদের যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই গণহারে গুলি করে মারা হয়েছে। বাজার ও শপিংমলগুলি আগন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।....”

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বা ২৬ বঙবন্ধু স্বাধীনতা শব্দটি করেছিলেন। এই একই সময় বাংলি দমনে অপারেশন সার্ট লাইট শুরু হয়। এই একই সময়ে বলা যেতে পারে বাংলির প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়, শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ যা মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধকে অনেকে বলেন স্বাধীনতাযুদ্ধও। আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে শব্দ দুটি সমার্থক মনে হলেও তফাং আছে প্রত্যয় দুটিতে। তফাংটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ-কারণে যে, শেষোক্ত শব্দটি সরকারিভাবে ব্যবহার করা হয় শুরু হয় সামরিক শাসনামলে, গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনে নয়। সে-কারণে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির দ্যোতনা প্রাক ১৯৭১ প্রজন্মের কাছে যতটা ব্যক্তিনাময়, স্বাধীনতাযুদ্ধ ততটা নয়।

মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি ব্যাপক, অর্থও। অন্যদিকে স্বাধীনতার বিষয়টি সংকীর্ণ, অর্থও। মুক্তিযুদ্ধ বলতে বোঝায় (বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে) বাংলালির সার্বিক মুক্তি, সব অর্থে। এখানেই বিভক্ত হয়ে যায় জনপ্রতিনিধি আর সামরিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনীতিবিদরা যেহেতু সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে উঠে এসেছেন, ছিলেন তাদের প্রতিনিধি, তাই ১৯৭১ সালে তারা অনুধাবন করেছেন, মুক্তি কেন ছিল প্রধান প্রশ্ন। আর সামরিক সমাজের প্রতিনিধির কাছে আশু ছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক মুক্তি। এই যে বিভাজনের সৃষ্টি, তা অব্যাহত এখনো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর সময়টাকুতেও দ্বন্দ্ব ছিল এ নিয়ে এবং এই যুদ্ধের নিরসন না হওয়ায়, এ পার্থক্যেই পরবর্তীকালে দ্বিখণ্ডিত করেছে সমাজ, রাজনীতি-সব।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষিত ও এলিট মহলে শব্দ দুটির দ্যোতনা দুরকম হতে পারে; কিন্তু একেবারে তৎমূল পর্যায়ে মুক্তি, স্বাধীনতা শব্দগুলোর পার্থক্য বিশেষ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। তাদের অনেকের কাছে ১৯৭১ সাল তো গঙ্গোলের বছরও। তার অর্থ কি এই যে, সে মুক্তি বা স্বাধীনতা চায়নি? তা নয়। তার প্রকাশভঙ্গিই এরকম। তার কাছে ১৯৭১, এ কারণে গঙ্গোলের বছর যে, এর আগে সে অর্থাৎ বাংলি এরকম সংঘাতের মুখোমুখি হয় নি। প্রকাশভঙ্গি যে-রকমই হোক, তাকে যদি শব্দ তিনটির মধ্যে কোনটি বেশি অর্থবহ চিহ্নিত করতে বলা হয়, তাহলে সে অবশ্যই ১৯৭১ সালকে চিহ্নিত করবে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে।

মুক্তি এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি যে হঠাতে করে আমাদের শব্দাবলিতে চলে এসেছে তা নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধও হঠাতে করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শুরু হয়নি। বহুদিনের পুঁজীভূত বঞ্চনা, নিপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি চেয়েছে সর্বতোভাবে— এই অনুভূতিই সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির, একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যে প্রত্যক্ষ সমরে অংশগ্রহণ করেছে সে মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং এই শব্দটির (যা হয়ে ওঠে একটি প্রত্যয়) অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় সর্বক্ষেত্রে মানুষের বা বাংলালির মুক্তি।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সবার জানা। সে-কারণে, নতুনভাবে তা বিবৃত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। সভ্যতার বিপরীতে এর অবস্থান। গণহত্যার ইংরেজি হয় জেনোসাইড। গ্রিক জেনোস এবং লাতিন সাইড শব্দ দুটি মিলে

জেনোসাইড শব্দের সৃষ্টি। জেনোস অর্থে বোঝায় জাতি। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গণহত্যার অর্থ কোন সরকার কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় জনগণকে নিকাশ করা। ১৯৪৪ সালে জেনোসাইড শব্দটি তখন ব্যবহার করা হয়। গণহত্যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত যার কোন ক্ষমা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ইহুদী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ওপর যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল বা গণহত্যা করেছিল তার বিচার হয়েছিল যা নুরেমবার্গ ট্রায়াল হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের ওপর গণহত্যা চালায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে। এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ আর কোথাও হত্যা করা হয়নি। আর এসবই করা হয়েছিল ইসলামের নামে।

১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই গণহত্যা নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রচার চালিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। পাকিস্তানীরাই প্রথম বিষয়টি সৃষ্টি করে। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়নি। ৩ লক্ষও নয়। ডেভিড ফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনাকালে শেখ মুজিব ও লক্ষকে ভুল ইংরেজিতে ত্রি মিলিয়ন বলেছিলেন।

আসলে বঙ্গবন্ধু তখন স্বীকৃত সংখ্যাটিই বলেছিলেন। মক্ষো থেকে প্রকাশিত প্রাভদা পত্রিকায়ই প্রথম ৩০ লক্ষ সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়। আমরাও বিভিন্ন পর্যায়ে অনুসন্ধান করেছি। এবং আমাদের মনে হয়েছে এই সংখ্যা ত্রিশ লাখেরও বেশি।

১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। রাজাকার, শাস্তি বাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর গণহত্যার কার্যক্রম আরো পরিকল্পিতভাবে চলতে থাকে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে গণহত্যা শুরু হয় এবং তা চলে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই গণহত্যা চালানো হয়েছিল। অনেক জায়গায় একসঙ্গে মৃতদেহ গর্ত করে পুতে রাখা হয়েছে যেগুলিকে আমরা গণকবর বলি। এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু স্থানে নিয়েও মানুষ হত্যা করে ফেলে রাখা হতো। এগুলি পরিচিত বধ্যভূমি হিসেবে। যেমন ঢাকার রায়ের বাজার বা শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যাবে। সংরক্ষণের অভাবে অবশ্য অনেক গণকবর বা বধ্যভূমি আজ বিলুপ্ত। আমাদের জরিপে ১০০০-এর বেশি গণহত্যা গণকবর ও বধ্যভূমির নাম পাওয়া গেছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে একটি গণহত্যার বিবরণ দেব। বলা যেতে পারে এটি ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গণহত্যা যেখানে একদিনে দশ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এই গণহত্যা চুকনগর গণহত্যা হিসেবে পরিচিত।

চুকনগর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত। খুলনার উত্তরে যশোর ও ফরিদপুর, পূর্বে ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালি, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এখন পাকা সড়ক ধরে অন্যায়সে স্বল্প সময়ে চুকনগর যাওয়া সম্ভব। ১৯৭১ সালে তা সম্ভব ছিল না। অধিকাংশ জমি ছিল নিচু, বিল, ডোবায় ভর্তি। তবে, চুকনগর থেকে সাতক্ষীরা সড়ক ধরে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার একটি পথ আছে। ১৯৭১ সালে এ পথ ধরেই মানুষ বাংলাদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে যেতে চেয়েছেন।

ডুমুরিয়া ধানার আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগর বাজারটি অত্যন্ত পরিষ্কৃত। তিনি দিকে নদী ঘেরা চুকনগরের বাজার। খুলনা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে ভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার সঙ্গে নদী ও সড়ক পথে তুলনামূলক ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য চুকনগর ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হানাদারদের গণহত্যা শুরু হয়। রাজাকার, শাস্তি বাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর গণহত্যার কার্যক্রম আরো পরিকল্পিতভাবে চলতে থাকে। স্থানীয় বাঙালি ও বিহারী সহযোগীরা হানাদারদের থানা-ইউনিয়ন পর্যায়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে থাকে। প্রধান টার্গেট হয় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগাররা। খুলনায় এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং এরই সূত্র ধরে চুকনগর গণহত্যা সংঘটিত হয়।

চুকনগর গণহত্যার কারণ কী সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেনি। তবে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিভিন্ন বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। খুলনার বিভিন্ন থানায় হানাদারদের সহযোগীরা সাধারণ মানুষজনের ওপর অত্যাচার শুরু করে বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর। ফলে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ভিটেমাটি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন যাবার পথটি ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে চুকনগর আসা। এবং তারপর দালাল অথবা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কারো সাহায্যে সীমান্তে পৌছা। হানাদার ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচার বাড়লে, দলে দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাটিয়াঘাটা, দাকোপ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট থেকে রওয়ানা দেন। নদীপথ বেশি কার্যকর হওয়ায় এ পথেই মানুষ এসেছিলেন বেশি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একই দিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এতো মানুষ চুকনগরে জমা হলেন কীভাবে? এগুলি মাসের শেষ দিকে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের অগ্নিসংযোগ, অত্যাচার, লুটপাট, নারী নির্যাতন, হত্যা চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করে। স্থানীয় পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও শ্রেণী শক্র নিধনের নামে একই কাজ শুরু করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ডুমুরিয়া, বাটিয়াঘাটা, দাকোপ, সাতক্ষীরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মানুষ ভারতের পথে রওয়ানা দেন।

সাক্ষণ্যকার থেকে জানা যায় বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ রওয়ানা হয়ে চুকনগর পৌছেন। যাদের যাওয়া সম্ভব হয়েছে তারা চলে গেছেন। বাকীরা ছিলেন যাওয়ার অপেক্ষায়। তাছাড়া হানাদাররা ‘আক্রমণ করতে পারে’ কিছু এলাকায় এই আশঙ্কার খবর ছড়িয়ে পড়লে ১৮/১৯ মে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষজন রওয়ানা হন এবং ২০ তারিখ দেখা যায় চুকনগর এলাকা লোকারণ্য হয়ে গেছে।

বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, খেয়াঘাটের জনৈক বিহারী খানের সঙ্গে খেয়া পারাপারের মূল্য নিয়ে কারো কোন বচসা হয়েছিলো। সেই খান ‘দেখে নেয়া’র বাসনায় হানাদারদের ব্যবর দিয়েছিলো। হানাদারদের স্থানীয় সহযোগীরাও এতে ইঙ্গিয়েছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ-‘মালাউন’ বা বিধৰ্মীদের পাক দেশ থেকে বের করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে তাদের টাকা, সোনাদানা লুট করা। এই হচ্ছে চুকনগর গণহত্যার পটভূমি।

২০ মে, বৃহস্পতিবার, সকাল থেকেই সবাই যাত্রার আয়োজন করেছিলো। অধিকাংশ পরিবারের ইচ্ছা ছিল ১০-১১টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে রওনা হবে। অন্যদিকে, চাপা আতঙ্ক ছিল খানিকটা। কারণ, বিহারী খানের সঙ্গে বচসা হয়েছিলো। বেলা দশটার দিকে সাতক্ষীরা সড়ক ধরে হানাদারদের দুটি ট্রাক বর্তমান চুকনগর কলেজের (৭১-এ কলেজ ছিল না) পশ্চিম পাশে কাউতলায় এসে পৌছায়। এই এলাকাটুকু তখন পাতখোলা নামে পরিচিত ছিল স্থানীয়দের কাছে। হানাদারদের সংখ্যা বেশি ছিল না। খুব সম্ভব এক প্রাচুর্য সৈন্য হয়ত এসেছিলো। হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ট্রাক থেকে নেমেই তারা শুলি করতে শুরু করে এবং চুকনগর পরিণত হয় এক মৃত নগরীতে।

গণহত্যা সম্পর্কে সব প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য একই রকম। প্রত্যেকেই হানাদার বাহিনীর আগমন ও নির্বিচার হত্যার একই রকম বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণের ডিটেলসে খানিকটা পার্থক্য আছে। একটির পর একটি বিবরণ যখন শনেছি তখন গণহত্যার স্বরূপটি অনুভব করতে পেরেছি। ‘ওরাল হিস্ট্রি’ এভাবেই ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। ভাবতে অবাক লাগে, স্বজন-পরিজন হারিয়ে কীভাবে পরিবারগুলি বেঁচেছিলো! চুকনগরে এই সাক্ষাৎকার শুনতে শুনতে আবেগে আপুত হয়ে জনকঠের রিপোর্টের ফজলুল বারী জনকঠে লিখেছিলেন, “লাশের ওপর লাশ, মায়ের কোলে শিশুর লাশ, স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী জড়িয়ে ধরেছিল। বাবা মেয়েকে বাঁচাতে জড়িয়ে ধরেছিল। মুহূর্তে সবাই লাশ হয়ে যায়। অন্দা নদীর পানিতে বয় রক্তের বহর, অন্দা নদী হয়ে যায় লাশের নদী। কয়েক ঘণ্টা পর, পাকিস্তানীদের শুলির মজুত ফুরিয়ে গেলে গেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে।”

এই হত্যাকাণ্ড চালাবার মাঝেও হানাদাররা কিছু নারীকে ধর্ষণ করে। কয়েকজনকে ট্রাকে করে তুলেও নিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের পর স্থানীয় লোকজন লাশ পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়ে। অধিকাংশ লাশই অন্দা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কিছু গণকবরে সমাহিত করা হয়।

গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত ধ্বংসযজ্ঞ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে চলে লুটপাট। বিভিন্ন এলাকায় অগ্নিসংযোগ করে ঘর বাড়ি সম্পদ ছাইয়ে পরিণত করেছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদররা। ১৯৭২ সালের পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা তুলে ধরছি-

নোয়াখালী ৭১ হাজার

নরসিংদী ৯০%

নওগাঁ ৫০ হাজার

শান্তাহার ৫ হাজার

জামালপুর ৭৫ হাজার

টাঙ্গাইল ২১৩৪৮ হাজার

বগুড়া ৮০ হাজার

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িটিও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আনরডের (জাতিসংঘ) হিসেবে ছয় হাজার গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাবটি দেখা যাক-

কুমিল্লা ১৪৬০

নওগাঁ ৩০ হাজার

সাতক্ষীরা ৭৫%

সিরাজগঞ্জ ৮০%

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক কুলসমূহের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি রাজশাহী  
বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ লাখ। মোট ৩৪৫৭টি প্রতিষ্ঠান খৎস হয়েছিল যার ক্ষতির পরিমাণ  
ছিল ১৩৫ কোটি।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ পাই তাহলো-

বিআইডিসি ১০ কোটি

ডিআইটি ২ লাখ

শিল্প প্রতিষ্ঠান ১৫০টি

ইমারত বিভাগ ৩ কোটি

বাস ১০০০

সেতু ২৭৪

কৃষি পণ্য ৩৯৪ কোটি

বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছিলো। যেমন :

রামগড় ৫ কোটি

রাজশাহী ৫ কোটি

ভৈরব শহর ১০০ কোটি

জামালপুর ১২ কোটি

ভৈরব বন্দর ৩০০ কোটি

চালনা বন্দর ১.৫০ কোটি

আনরঙ্গের হিসাব মতে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৯৩০ কোটি। ৪ লাখ  
শিশু সম্পূর্ণ নিঃশ্ব হয়ে গিয়েছিল। সর্বশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল কুমিল্লার ৪০ হাজার জেলে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যখন বলা হয় ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিলেন, আজকাল  
অনেক বাঙালিই তা মানতে চান না। এ বিষয়েও বিতর্কে মেতে ওঠেন। 'গণহত্যা'  
শিরোনামে আমরা এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাই। অধিকাংশ প্রতিবেদনই ছিল ১৯৭২  
সালের। আঝলিকভাবে আমরা সামান্য যে হিসাব পাই তাতেই বিস্মিত হতে হয়।  
কয়েকটি উদাহরণ

[অঞ্চলিক নিহতদের হিসাব]

দিনাজপুর ৭৫,০০০

কুষ্টিয়া ৪০, ০০০

চাঁদপুর ১০,০০০

নওগাঁ ২০,০০০

বরিশাল শহর ২৫,০০০

কুমিল্লা ২০,০০০

ঝালকাঠি ১০,০০০

নড়াইল ১০,০০০

রংপুর ৬০,০০০

বগুড়া শহর ২৫,০০০

আখাউড়া ২০,০০০

জামালপুর ১০,০০০

ঠাকুরগাঁও ৩০,০০০

চৌক্ষিক থানা ১,০০০

চট্টগ্রাম ১ লাখের ওপরে

বৰুপকাঠি ও বানরীপাড়া ৫০০০

সেতাবগঞ্জ ৭০০০

মানিকগঞ্জ ১০০০

পার্বতীপুর ১০,০০০

নরসিংদী ১০১৯

সৈয়দপুর ১০,০০০

হাজিগঞ্জ ৩০,০০০

কুড়িগ্রাম ১০,০০০

এছাড়া হরিপুরে একটি পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল ১০,০০০ নরমুগু। কুমিল্লায় ১১  
দিনে উদ্ধার করা হয়েছিল ৫০০, জয়পুরহাটে একদিনে ৫০০-এর বেশি, দিনাজপুরের

দুটি গ্রামে ৩৭০০০, শেরপুর জেতিতে ২০০০। যা কুরিয়ার হিসেবে কাজ করতেন সে রকম ১৫০ জন গিয়েছিলেন বাঘের পেটে। স্বাধীনতার পর হানাদার বাহিনীর পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন ৯৬ জন। আরো জানা যায় নিয়াজী মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশে হত্যা করা হয়েছিল ১৫ লাখ মানুষকে। হানাদার বাহিনীর হিসাব যদি হয় ১৫ লাখ তাহলে ৩০ লক্ষ সংখ্যাটিতো খুব বেশি নয়।

যে কোন যুদ্ধে সবচেয়ে প্রথম এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নারী। মুক্তিযুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম নয়। ধর্ষিত বা নির্যাতিত নারীর সংখ্যা নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সে সময় বিদেশী প্রতিবেদনেও এ সংখ্যা প্রায় ১০ লাখের মতো বলা হয়েছে। ডা. জিওফ্রে ডেভিসও যে সংখ্যা দিয়েছিলেন সাম্প্রতিক গবেষণায় তাও সঠিক মনে হয় না। 'বীরাঙ্গনা ১৯৭১' শীর্ষক গবেষণা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এ সংখ্যা আনুমানিক ৬ লক্ষের কাছাকাছি। মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা কমাতে পরবর্তীকালে বিশেষ করে পাকিস্তানী মানুষজন সেই সংখ্যাক্রাস করতে বলাতে থাকেন। সম্প্রতি শর্মিলা বসু নামে এক গবেষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত তার গ্রন্থে এ সংখ্যা উল্লেখ করেছেন মাত্র ও হাজার। এ সবই সত্যের অপলাপ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিতা নারীদের বিষয়টি সব সময় উপেক্ষিত হয়েছে। বঙবন্ধু তাদের যথাথ মর্যাদা দিতে চাইলেও তাতে সফল হননি। ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত পত্রিকায় নারী নির্যাতনের বিষয়টি এসেছে। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর থেকে দেখি বিষয়টি সংবাদপত্রে উপেক্ষিত। বর্তমানে এ বিষয়টি আবার আলোচনায় আসছে এবং এ নিয়ে কিছু লেখালেখি হয়েছে। সে কারণে বিষয়টির ওপরও সামান্য আলোকপাত করবো।

নির্যাতিতা নারীরা সব সময় অবমাননার শিকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি প্রহর তাদের কেটেছে আতঙ্কে, যারা নির্যাতিতা হয়েছে তাদের ভাগ্য তখনই নির্ধারিত হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও নির্যাতিতাদের শুন হয়নি। ট্রাজেডি এখানেই। আমরা নাকি 'মা-বোনদের ইজ্জত' করি। বস্তুত এ ধরনের ভওামি আছে খুব কম সমাজেই। বঙবন্ধু এদের 'বীরাঙ্গনা' অভিধায় ভূষিত করে সমাজে সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, সমাজ তাদের গ্রহণ করছে না। ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর স্বামী আহসানউল্লাহর সংখ্যা দু'একজনের বেশি নয় যিনি প্রকাশ্যে গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আছি। তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন।' অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমনকি পিতামাতাও। নীলিমা ইত্রাহিমের বইতে তার বিবরণ আছে। নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা ছিল কেমন? এ সংখ্যা কখনো নির্দিষ্ট করা যায় নি, করা সম্ভবও নয়। আর আমরা যে সংখ্যাই বলি তাই চ্যালেঞ্জ করা হয়, এদেশেও। তাই আমি বাংলার বাণীতে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এক অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তারের প্রতিবেদনের কিছু অংশ উন্মুক্তি করছি। তার নাম ডা. জিওফ্রে ডেভিস। ঐ সময় থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি নির্যাতিতা

নারীদের সেবা প্রদানের জন্য। তাঁর মতে, মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নারীর অবস্থা চাকর থেকের কম নয়। এবং সেই হিসাবের তিনি একটা পুরুষানুপুরুষ বিবরণ দিয়েছেন- “ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্য ফেরুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের হিসাব মতে ধর্ষিত মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিস বলেন, অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।

অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংগ্রাহক কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ-কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।...

ধর্ষিত মহিলাদের যে হিসাব সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারী হিসাব করেছেন। সারা দেশের ৪৮০টি থানা ২৭০ দিন পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্করূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু হানাদারবাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাব রক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীদের অন্তর্ভুক্ত লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে।”

বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অধ্যাপিকা নীলিমা ইবাহিম। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ নামে দু’খণ্ড এ সম্পর্কে তিনি গ্রস্ত ও রচনা করেছেন। তাঁর বিবরণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের নারী নির্যাতনের অনেক বিবরণ আছে। যেমন- “আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোন ক্যাম্পে নাকি কোন ঘেরে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্রাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-ঝোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা জাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠত।”

শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, বীরাঙ্গনাদের যে তালিকা ছিল স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তা বিনষ্ট করে ফেলার জন্য বলছিলেন কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হলেও সমাজের মৌল কোনো পরিবর্তন হয়নি। সমাজ এদের গ্রহণ করবে না।

বঙ্গবন্ধু সরকারই বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সে সব পুনর্বাসন প্রকল্প স্থগিত করে দেন। এরপর থেকে বীরাঙ্গনারা শুধু উক্ষেপিত হয়েছেন এ সমাজে যা খুবই

বেদনাদায়ক।

এ ছাড়া কত লক্ষ মানুষ নির্যাতিত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন তার নির্দিষ্ট সংখ্যা কখনও নিরূপণ করা যাবে না।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বাঙালিদের দেশত্যাগ যাদের এক শব্দে শরণার্থী বলে উল্লেখ করা হয়। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসরদের হত্যা, নিপীড়ন, ধর্ষণ এভাবে ২৬ মার্চ থেকে মানুষজন প্রথমে গ্রামে এবং তারপর সীমান্ত পেরুচ্ছে থাকে শরণার্থী হিসেবে। শরণার্থী হিসেবে সীমান্ত অতিক্রম করার সময়ও অনেকে নিহত হন যাদের গণহত্যার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শরণার্থী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতি প্রকৃতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। ১৯৪৭ সালের পর ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এত মানুষ আর বাস্তিভিটা ত্যাগ করেননি। এর অনেকগুলি দিক ছিল। প্রথমতঃ বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ভারতে শুধু অর্থনৈতিক নয় আরো নানাবিধি সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সমস্যার সমাধানে একমাত্র উপায় ছিল পাকিস্তানের পরাজয় ও মুক্তিযুদ্ধের জয়। যে কারণ ভারত [আরো কারণের মধ্যে একটি] এর দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে অন্তিমে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চললে শরণার্থীর চাপ সহ্য করা সম্ভব হতো না ভারতের পক্ষে এবং স্থায়ীভাবে এত শরণার্থী রাখা সম্ভব ছিল না সীমান্তে। একটি উদাহরণ দিই। ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান ছিল শরণার্থীর সংখ্যা। ভারত সরকারকে প্রতিদিন দু'কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছিল শরণার্থীদের জন্য। দ্বিতীয়তঃ অনবরত শরণার্থী সীমান্ত পেরুনোতে পাকিস্তান একথা প্রমাণ করতে পারছিল না যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে বিশ্ব জনমত তার পক্ষে নেয়া সম্ভব হয়নি। তৃতীয়তঃ এই শরণার্থী সমস্যাকে প্রধান করে তুলে ভারত আবার বিশ্বজনমত তার পক্ষে আনতে পেরেছিল, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও।

বাংলাদেশের একদিকে ভারত এবং এই সীমান্ত মোট সীমান্তের প্রায় ৯৪ ভাগ, অন্যদিকে মিয়ানমার সীমান্ত বাকি ৬ দফা। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু বাসিন্দা সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন মিয়ানমার এবং মিয়ানমার যেহেতু এই যুদ্ধ সহানুভূতির সঙ্গে দেখেনি এবং সেই সীমান্ত রেখা পেরুনো ছিল বুকিপূর্ণ তাই শরণার্থী সেখানে বেশি যায়নি। অন্যদিকে, ভারতীয় সীমান্ত ছিল খোলামেলা পেরুনো সহজ। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়ের মানুষজন সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। উভয় অঞ্চলের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিল ছিল। অনেকের আজীব্যস্বজনও ছিলেন ওপারে।

শরণার্থীদের স্নোত এপ্রিল থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। কত শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার সঠিক হিসাব না পেলেও ভারতীয় হিসাব অনুযায়ী সে সংখ্যা ছিল ৯৮, ৯৯, ৩০৫ জন। এটি হচ্ছে ক্যাম্পের হিসাব। ক্রিস্ট, ক্যাম্পের বাইরেও ছিলেন অনেক শরণার্থী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোনো দেশ থেকে এতো কম সময়ে এতো মানুষ শরণার্থী হননি।

শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, বিহার,

মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে। তবে, চাপ বেশি ছিল মুক্তিযোদ্ধা ভারত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শরণার্থীদের সাহায্য দেয়ার ও শান্ত রাখার।

এক কোটি শরণার্থীকে স্বাভাবিকভাবেই মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে। কলেরা ও অন্যান্য রোগে মারা গেছেন অনেকে। তবে, শুধু ভারতবাসী নয়, শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ। যে যতটুকু পেরেছেন তা দিয়ে শরণার্থীদের সাহায্য করেছেন। অন্যদিকে, প্রবাসী বাঙালি ও বিশ্ববাসী ও এগিয়ে এসেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্যে। সে দানও ছিল অপ্রতুল। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, ভারত সরকার, ভারতীয় জনগণ, প্রবাসী বাঙালি, জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ যদি শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে না আসতেন তাহলে ভারতের সঙ্গে এ ভার বহন করা সম্ভব হতো না এবং আরো অনেকে যে মৃত্যুবরণ করতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৬ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর মানুষ দেশে ফেরা শুরু করেন।

## দুই

সরকার গঠন ও তার অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বড় ধরনের দূরদর্শিতা। আর কোন দেশে যেখানে এ ধরনের যুদ্ধ হয়েছে সেখানে এতো দ্রুত [প্রবাসী সরকার এক অর্থে] সরকার গঠন সম্ভব হয়নি।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামেই বেশি পরিচিত। অনেকে একে প্রবাসী সরকারও বলেন। তবে, বাংলাদেশে সরকার বা মুজিবনগর সরকার বলাটাই শ্রেয়। এ সরকারের অধীনে জনযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারকে খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই যদিও অনেকে সে প্রচেষ্টা চালান।

২৫ মার্চের পর আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অনেক নেতা, কর্মী, সেনা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তাজউদ্দীন আহমেদ ৩০ মার্চ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ২ এপ্রিল দিল্লী যান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। আলোচনা ফলপ্রসূ হয় এবং ফিরে এসে তাজউদ্দীন অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। এ সরকার গঠন নিয়ে শুরুতে এবং পরে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিলো কিন্তু তাজউদ্দীনের দৃঢ়তার ফলে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তাজউদ্দীন ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন ও ১১ এপ্রিল এক বেতার ভাষণ দেন। ১৭ এপ্রিল নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। নতুন সরকার বৈদ্যনাথতলার নাম পাল্টে রাখেন মুজিবনগর। ১৭ তারিখের আগে সরকার ঘোষণার কথা কাউকে জানানো হয়নি। সাংবাদিকদের কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে ভবেরপাড়া নেয়া হয়েছিলো না জানিয়ে।

সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সহিত উপ-  
রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী  
এবং খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ. এম  
কামরুজ্জামানকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও এম.এ.জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত  
করা হয়। সরকার ছিল সংসদীয় সরকার। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দেশের নামকরণ  
করা হয় ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’। তৎকালীন কেবিনেট সচিব তওফিক ইমাম  
লিখেছেন, “অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অপর তিনমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশনায়  
আমরা, অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সচিববৃন্দ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  
করতাম। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধান সেনাপতি মুক্তিযুক্ত সংজ্ঞান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড  
পরিচালনা করতেন সেষ্টের কমান্ডারদের মাধ্যমে।”

সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা ছিল বারোটি। যুদ্ধের সেষ্টের ছিল ১১টি,  
এর সঙ্গে গঠিত হয় ১১টি আঞ্চলিক পরিষদ যার সদস্য ছিলেন মূলত : রাজনীতিবিদরা।  
এই কাউন্সিলকে সহায়তা করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয় একজন আঞ্চলিক প্রশাসনিক  
কর্মকর্তার। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা  
পরিষদও গঠন করা হয় যা কখনও কার্যকর ছিল না। আনন্দবাজার এক আবেগপূর্ণ দীর্ঘ  
রিপোর্ট ছেপেছিলো ১৮ এপ্রিল। আনন্দবাজারে সাধারণত: এত বড় প্রতিবেদন ছাপা  
হতো না। এর শিরোনাম ছিল-‘নতুন রাষ্ট্র নতুন জাতি জন্ম নিল’।

“একটি রাষ্ট্র আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিল। এই নতুন নগরে সে রাষ্ট্রের  
নাম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম  
দেশ। তার জন্মলগ্নে আকাশে থোকা থোকা মেঘ ছিল। তার জন্মলগ্নে চারটি ছেলে প্রাণ  
চেলে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ গানটি গাইল। তার জন্মলগ্নে  
পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করা হল। তার জন্মলগ্নে সহস্র কষ্টে জয়ধ্বনি উঠল  
‘জয় বাংলা’।

মুজিবনগর সরকারের বড় কৃতিত্ব ‘স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র’ দিয়ে পাকিস্তানের  
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বিশ্বে যে ক’টি দেশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছিল  
বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ইংরেজিতে প্রণীত  
প্রক্রমেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষিত ও জারি করা হয় এবং ২৩শে মে ১৯৭২  
তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

### “স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনুদিত)

মুজিবনগর, বাংলাদেশ  
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের  
৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন  
অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে জাতীয়ামী  
লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত  
প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সালের ৩৩ মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনিদিষ্টকালের জন্য  
স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের  
প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও  
বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে  
সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের  
জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ  
তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা  
ও অধিকার রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের  
মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও  
গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং  
অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত  
হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব  
করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপুর্বী উদ্দীপনার  
মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার  
অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থ, নিজেদের সমস্যায়ে  
যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম,

এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাচী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মূলত্বিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতাত্ত্বিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহার প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রূতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাণ প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও  
তদবীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাণ প্রতিনিধি।

[সংবিধান থেকে উদ্ধৃত]

স্বাধীনতার ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এটি প্রতিনিধিত্ব করে। এবং মুক্তিযুদ্ধ সেই সরকারের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে। ঘোষণাটি ২৪ অনুচ্ছেদের। ঘোষণায় মূলত যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল, তা হলো—১৯৭০ সালের যুক্ত নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। ১৬৯ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৭। এ কারণে জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ঢোকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন; কিন্তু পরে বেআইনি ও একত্রফাভাবে তা স্থগিত রাখা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের সম্মান ও সংহতি রক্ষার আহ্বান জানান। এ পটভূমিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙবন্ধুর সেই ঘোষণাকে অনুমোদন করছে।

ঘোষণাটি আইনের ভাষায় রচিত এবং তা রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম। এ ঘোষণায় গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাক্য হচ্ছে—

“বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাঙ্গে বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।”

বাংলাদেশের মানুষের শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়মূলক সরকার প্রদানের [জন্য] যা যা করা দরকার তা করবেন।

এ ঘোষণায়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের তারিখ ঘোষিত হয় যা নিয়ে এখনও হাস্যকর সব বিতর্ক হয়। মুজিবনগর ঘোষণায় পরিষ্কারভাবে লেখা আছে— “আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।”

এই তারিখে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম “অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন বলবৎকরণ আদেশ জারি করেন। এ আদেশের বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত স্থাপিত হয়। শেষ হয় মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রথম পর্যায়। এর পরের পর্যায় হলো সরকার গঠন, শপথ ও কার্যক্রম পরিচালনা।

১১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের একটি দীর্ঘ ভাষণ প্রচার করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে। এ ভাষণটির কথা অনেকের মনে নেই; কারণ কোথাও এর উল্লেখ নেই। উপসংহারে যে মন্তব্যগুলো করেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ—

১. আমাদের যুক্ত দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস।
২. আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শক্ররা আরও অনেক রক্তক্ষয় ও ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করবে।

৩. এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ...এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ।

আনুষ্ঠানিকভাবে জন্য নিল বাংলাদেশ। এরপরই মন্ত্রিসভা, মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন,

যুদ্ধ চালনা, সিভিল কর্তৃত প্রতিষ্ঠার কাজে বাঁপিয়ে পড়লেন। এ সব হাতহাস আমাদের জানা। মুজিবনগর সরকারের অধীন (যার প্রধান ছিলেন শেখ মুজিব) যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। এক্ষেত্রে জনাব তাজউদ্দীনের নেতৃত্ব অবশ্যই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকাশ্য শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ দীর্ঘ এক প্রেস স্টেটমেন্ট প্রদান করেন, যার শিরোনাম ছিল ‘টু দি পিপল অফ দি ওয়ার্ল্ড।’

দীর্ঘ এ প্রেস স্টেটমেন্টে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। এর মূল সূত্রগুলো ছিল এ রকম-

পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় স্বাধিকার সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হয়েছে।

পাকিস্তান কাঠামোর ভেতর বাংলাদেশের স্বায়ত্ত্বাসনের জন্য ছয় দফা দেয়া হয়েছিল এবং ১৯৭০ নির্বাচনের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল।

এর আগে আর কোন দাবির প্রতি মানুষ এমন ব্যাপক সমর্থন জানায়নি। সিক্রি ও পাঞ্জাবে যেখানে ভূট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সেখানে ছয় দফার কথা নির্বাচনের সময় উল্লেখ করা হয়নি। বালুচিস্তানে যেখানে ন্যাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা ছয় দফার প্রতি অঙ্গীকারিবন্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও অধিকমাত্রায় স্বায়ত্ত্বাসনের কথা বলা হয়েছিল।

ইয়াহিয়া-ভূট্টোর ষড়যন্ত্র সন্ত্রেও পিপলস পার্টি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নির্বাচিত সদস্য পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া এ্যাজমিরাল আহসানকে বরখাস্ত করেন। যাকে মডারেট মনে করা হতো। মন্ত্রিসভায় বাঙালি সদস্যদের বরখাস্ত করা হয়, যাতে ক্ষমতা একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জাত্তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

ইয়াহিয়া-ভূট্টোর সঙ্গে আঁতাত করে এগুলো করেছেন; কারণ তারা চাননি পাকিস্তানের পার্লামেন্টই ক্ষমতার আসল উৎস হয়ে উঠুক।

এসব কারণে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছিল শেখ মুজিবকে এবং নিজেদের স্থাপন করেছিল তার কর্তৃত্বের অধীনে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আওয়ামী লগি বাধ্য হয়ে অর্থনীতি ও প্রশাসন সচল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শুধু মানুষ নয়, প্রশাসন ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ও শর্তহীনভাবে সমর্থন দিয়েছে। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশ মেনে চলেছে এবং নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগকেই একক কর্তৃত হিসেবে মেনে নিয়েছে।

ইয়াহিয়া ৬ই মার্চ এক প্রোচনামূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা আসবে।

যদিও মানুষ স্বাধীনতা চাচ্ছিল; কিন্তু শেখ মুজিব আবারও রাজনৈতিক সমাধানের পথে যেতে চেয়েছিলেন।

তাজউদ্দীন এরপর ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, “লাশের পাহাড়ের নিচে পাকিস্তান এখন মৃত ও কবরস্থ এবং এসব ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে ইয়াহিয়া ও তার সমর্থকরা অনেক আগে থেকেই দুই দেশের তন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল।”

তাজউদ্দীন সবশেষে আশা ব্যক্ত করে বলেন, “বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ছাই থেকে এক নতুন দেশ গড়ে তোলা। তাই ছোট-বড় সকল শক্তির সহযোগিতা তার কাম্য-

We do not aspire to join any block or pact but will seek instance from those who give it in a spirit of goodwill free from any desire to control our destinies. We have struggled for too long for our self determination to permit ourselves to become any ones statelite.”

স্বাধীনতার ঘোষণা ও তাজউদ্দীন আহমেদের বক্তব্য এ কথাটিই ধ্বনিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে সমতা, মানবিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার রক্ষাকঞ্জে এবং ন্যায়মূলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য। আদর্শগুলো প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে। শাসনতন্ত্রের চারটি মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল— জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই বিবেচনা করা হত যে, সমাজতন্ত্র মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে ও মানুষের সম্মান নিশ্চিত করে। ন্যায়মূলক সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হতো সংসদীয় গণতন্ত্রকে। এ সমস্ত আদর্শ রক্ষা করা যাবে যদি কোন শক্তির লেজুড় না হওয়া যায়। এবং কোন জোটে আবক্ষ না হওয়া যায়। যে কারণে বাংলাদেশ সরকার জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল।

## তিনি

সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তা নয়। এ যুক্তের তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে স্বতন্ত্রত্ব প্রতিরোধ। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে সরকারের অধীনে সংঘটিত প্রতিরোধ। শেষ পর্যায় হচ্ছে যৌথ কমান্ডের অধীনে বিজয় অভিযান।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ঢাকার গণহত্যার খবর পৌছাই মাত্র ঢাকার বাইরে প্রতিরোধ শুরু হয়। এর মধ্যে চট্টগ্রামে মেজর রফিক ও পরবর্তীকালে মেজর জিয়ার প্রতিরোধ উল্লেখযোগ্য। তারা অবশ্য পরে পিছু হটে যান। চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান তার ইপিআর বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধ করেন। মেজর খালেদ মোশাররফ ব্রাক্ষণবাড়িয়ায়। সবচেয়ে আগে প্রতিরোধ শুরু করেন মেজর শফিউল্লাহ রাজেন্দ্রপুরে। এভাবে বিভিন্ন রেজিমেন্টে বাঙালি অফিসার যারা ছিলেন তাদের অনেকে স্বপক্ষ ত্যাগ করেন। তাদের কমান্ডের অধীনে বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে প্রাথমিক প্রতিরোধ করেন। প্রায় ক্ষেত্রে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, ছাত্র যুবক জনতা সংগঠীত পুরনো আমলের অন্ত দিয়ে প্রতিরোধ করেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, ২৬ মার্চ থেকেই স্বতন্ত্রত্ব প্রাথমিক প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায় যদিও এসব প্রতিরোধ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে

পাকিস্তানী সেনাদের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়ে। অনেকে তখন সীমান্ত ধৈরিয়ে যান নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার জন্য। অনেকে দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

অসংগঠিত বা পরে সংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিফৌজ, বা মুক্তিসেনা নামেই অভিহিত করা হতো। পরে যারাই যুদ্ধ করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা এবং যোদ্ধাদের সংগঠিত বাহিনীতে মুক্তি বাহিনী হিসেবেই অভিহিত করা হয়েছে।

এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে সিলেটের ডেলিয়াপাড়া চা-বাগানে পাকিস্তান ত্যাগী বাঙালি সেনা অফিসারদের এক বৈঠক হয়। সেখানে চারজন সিনিয়র অফিসারকে যুদ্ধের দায়িত্ব দেয়া হয়। ব্রাক্ষণবাড়িয়া সিলেট অঞ্চলের দায়িত্ব পান মেজর শফিউল্লাহ, কুমিল্লা-নেয়াখালীর মেজর খালেদ মোশাররফ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মেজর জিয়াউর রহমান ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে মেজর আবু উসমান চৌধুরী। কর্নেল উসমানীকে সেনানায়ক হিসেবে ঠিক করা হয়।

১০ এপ্রিল সরকার গঠনের পর সরকার যুদ্ধকে নিজের কর্তৃত্বে এনে সংহত করার দায়িত্ব নেন। ১০ থেকে ১৭ জুলাই সিনিয়র অফিসারদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলন শেষে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ও বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বিভিন্ন জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১২ এপ্রিল থেকে সদর দফতরের কাজ শুরু হলে অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এএম এ রবকে চীফ অব স্টাফ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ নিয়োগ করা হয়।

আরো কিছু দিন পর তিনটি ব্রিগেড সৃষ্টি করা হয়। ব্রিগেড প্রধানদের নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়। মেজর জিয়া, মেজর শফিউল্লাহ মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ‘জেড’, ‘এস’ ও ‘কে’ ফোর্স গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, মেজর জিয়া ছাড়া সবাই সেক্টর কমান্ডারও ছিলেন।

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনিয়মিত ও নিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিতদের গণবাহিনী বলা হতো। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিল সৈন্যরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপিআরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকিরা গণবাহিনীতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে গণবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও অনেকে মুক্তি সেনাদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী সৃষ্টি করেন। যেমন টাঙ্গাইলে কাদের সিন্ধিকীর কাদেরিয়া বাহিনী, সিরাজগঞ্জে রফিক মির্জা বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, ঝিনাইদহের আকবর [হোসেন] বাহিনী, বরিশালের কুন্দুস বাহিনী, ময়মনসিংহে আফসার বাহিনী প্রভৃতি।

ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল ওবানের অধীনেও বঙ্গবন্ধুর নামে ‘মুজিব বাহিনী’ নামে আরেকটি বাহিনী গঠিত হয়।

বিভিন্ন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণের পর অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রবেশ করে গেরিলা কার্যক্রম চালানোর জন্য এবং অচিরেই তারা হানাদার

২৮ ডিসেম্বর এ কে খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিমান বাহিনী। পাকিস্তান আগস্টে নৌ সেনাদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয় প্রথম নৌবহর 'বঙ্গবন্ধু নৌবহর'। এ ছাড়া নৌ কমান্ডোও গঠিত হয়।

ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে। প্রবাসীরাও অস্ত্র সংগ্রহে সহায়তা করেন। এছাড়া পাকিস্তানী সেনাদের থেকেও [যুক্তি পরাজিত] অস্ত্র যোগাড় করা হয়। এভাবে বিভিন্ন সেষ্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিঙ্গ হয় মুক্তিবাহিনী যার পুরিসমাপ্তি ঘটে যৌথ বাহিনীর কমান্ডে বিজয় অভিযানে।

## চার

মুক্তিযুক্তে প্রচার ছিল জয়ের একটি হাতিয়ার। বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে ছিল দেখে, জয় দ্রুত সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের মানুষকে সরকারের প্রচার বিভাগ, বিদেশী প্রচার মাধ্যম অন্যান্য যুক্তের ভয়াবহতা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। এবং এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

২৫ মার্চ যখন যুদ্ধাবস্থা তখন থেকেই চট্টগ্রাম বেতারের বেশ কিছু কর্মী বেতার প্রচার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং আপদকালীন সময়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিছিলেন। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বেতার কর্মীরা যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ। এই বেতার কেন্দ্র থেকে কিছু ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তানী বাহিনী গোলাবর্ষণ শুরু করলে বেতার কর্মীরা চলে যান কালুরঘাট এবং সেখানকার এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার থেকে প্রথম আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নানের কস্টে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করে শোনান। এবং তারা বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্রবী বেতার কেন্দ্র'। ইতোমধ্যে জিয়াউর রহমান পিছু হটে কালুরঘাট পৌছেন। বেতার কর্মীরা একজন সেনা অফিসার খুঁজছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের জন্য যাতে মানুষ উদ্বীগ্ন হয়। তারা মেজর জিয়াকে খুঁজে পান। জিয়া বেতার কেন্দ্রে অবস্থান নেন ২৭.২৮.৩০ মার্চ। এই কেন্দ্র থেকে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে শোনান।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা ইতিমধ্যে বিদেশী প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে। তার সঙ্গে একজন সেনা অফিসারের বেতার ভাষণ নতুন মাত্রা যুক্ত করে। বাংলাদেশে স্বতন্ত্র প্রতিরোধের বার্তা মানুষের কাছে পৌছে যায়।

৩০ মার্চ পাকিস্তান বাহিনী কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করলে জিয়াউর রহমান বেতার কর্মীদের ফেলে রেখে চলে যান। আবুল কাসেম সন্দীপ, বেলাল মোহাম্মদ ও আরও কয়েকজন বেতার কর্মী এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি প্রথমে রায়গড় তারপর আগরাতলা নিয়ে যান। সেখান থেকে অনিয়মিতভাবে ২৪ মে পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান অনিয়মিতভাবে প্রচারিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, জিয়াউর

রহমান কালুরঘাটে ভাষণ প্রচারের সময় 'স্বাধীন Andijani Coding Bd' থেকে বিপুরী শব্দটি কেটে দেন।

বাংলাদেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংসদ সদস্য আবদুল মান্নানকে দায়িত্ব দেয়া হয় বেতার কেন্দ্র সংগঠিত করার। ২০ মে ৫০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্প্রচার শুরু করে। সকাল সাতটায় এবং সক্ষ্য সাতটায় দু'টি অধিবেশন সম্প্রচারিত হতো।

অচিরেই স্বাধীন বাংলা বেতারে যুদ্ধের খবরাখবর, গান এবং এমআর আর আখতার মুকুলের বিশেষ কথিকা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যুদ্ধের খবরাখবর শুনে এবং তা ইতিবাচক হলে মানুষ আশায় বুক বাঁধতো। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গানগুলি মানুষের মন শুধু জয় নয় মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। এই গানগুলি এখনও জনপ্রিয়।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতেন। মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবিরে স্বাধীন বাংলা বেতার ছিল সহযোগ। যুদ্ধে ১১টি শ্বীকৃত সেন্টার ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার যেভাবে মানুষকে আশাপ্রিয় ও উজ্জীবিত করেছিল তা অভূতপূর্ব। তাই স্বাধীন বাংলা বেতারকে যদি মুক্তিযুদ্ধের ১২নং সেন্টার বলি তাহলে সত্যের অপলাপ হবে না।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী সামরিক জুঙ্গা বিদেশী সাংবাদিকদের আটক করে। মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশের খবরাখবর বিদেশী প্রচার মাধ্যমে স্থান করে নিয়েছিল। ২৫ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের খবরাখবর আর পাওয়া যাচ্ছিল না। সাংবাদিকদের মধ্যে লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের ২৭ বছর বয়সী সাইমন ড্রিংকও ছিলেন। তিনি প্রেফতার এড়িয়ে ২৭ মার্চ তার আলোকচিত্র নিয়ে সারা শহর চষে বেড়ান এবং ২০ রোল ছবি তোলেন। কিছু ছবি জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে লন্ডন পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন এবং তারপর ঢাকা ত্যাগ করেন।

লন্ডনে ফিরে ডেইলি টেলিগ্রাফে তিনি প্রথম ঢাকার গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন, সারা বিশ্বের মানুষজন প্রথম গণহত্যার খবর জানতে পারে। এরপর নানা বিধি নিষেধ থাকা সঙ্গেও বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলি বাংলাদেশের খবরাখবর সংগ্রহ করে ছাপতে থাকে। মে মাসে পাকিস্তানী সাংবাদিক এ্যাসুনি ম্যাসকারেনহাস এখন সারাদেশে কীভাবে গণহত্যা চালানো হয়েছে তা তুলে ধরেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের হয়ে বাংলাদেশ সফর করে লন্ডন চলে যান। ম্যাসকারেনহাসের প্রতিবেদনের পর সারা বিশ্বে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এমন কোনদিন ছিল না যেদিন বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোন না কোন প্রতিবেদন বিশ্ব মিডিয়ায় স্থান করে নিত।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বেতার মাধ্যম। বিদেশী বেতার কেন্দ্রগুলি বিশেষ করে বিবিসি, আকাশবাণী ও অস্ট্রেলিয়া বেতার বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বিবিসির মার্ক টালির প্রতিবেদন ও আকাশবাণীতে দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের কঠো রাজনৈতিক ভাষ্য শোনার জন্য বাঙালি উন্মুখ হয়ে থাকতেন। বিবিসি শুনতে হতো গোপনে। বাংলাদেশের

একটি এলাকার ছোট একটি বাজারে গোপনে মানুষের মিতি প্রচারের নামই হয়ে গিয়েছিল বিবিসি বাজার।

এভাবে প্রচার মাধ্যমগুলি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করতে পেরেছিল। তাদের প্রচারে স্ফুর্ক নাগরিক সমাজ বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে বাংলাদেশের পক্ষে।

## পাঁচ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব এবং পরাশক্তিসমূহ দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, পরাশক্তির মধ্যে পাকিস্তান ও চীন ছিল একপক্ষে, অন্যপক্ষে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইউরোপীয় দেশগুলি কম বেশি সমর্থন করেছে বাংলাদেশকে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি পাকিস্তানকে।

দুঃখের হলেও সত্য যে, ইসলাম রক্ষার নামে পাকিস্তানীরা বাঙালি মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করে। অথচ, বাংলাদেশ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। পাকিস্তান প্রচার করে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। কিন্তু হিন্দু ভারত পাকিস্তানের অবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করতে চায় তাই গুটিকয় বাঙালির 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলনকে তারা সমর্থন করেছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি এই প্রচার মেনে নেয়। পাকিস্তানের গণহত্যার সমর্থনে এগিয়ে আসে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহ। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা ওআইসিও সমর্থন করে গণহত্যাকে। সংস্থাটি পাকিস্তানকে সমর্থন করতে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানায়।

জাতিসংঘেও যে মুক্তিযুদ্ধ আলোচিত হয়নি তা নয়। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে তিনি পরাশক্তির বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে, জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএনএইচসি আর শরণার্থীদের সহায়তা করেছিল।

পাঞ্চাত্যের বা ইউরোপের সোভিয়েত বলয় ভূক্ত দেশসমূহ সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। মার্কিন বলয়ভূক্ত দেশসমূহ কিন্তু আবার মার্কিনী সরকারের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়নি। তারা গণহত্যার নিন্দা করেছে। শরণার্থীদের সহায়তা করেছে, রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানিয়েছে।

চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকেই ভারতকে সমর্থন করেছে এবং ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করেছে। তবে চীনের গণহত্যা সমর্থন বিশ্বজুড়ে এমনকী ভারত ও বাংলাদেশের চীনাপন্থী কমিউনিস্টদের বিপদে ফেলেছে।

সাধারণের কাছে পরাশক্তি ও বিভিন্ন দেশের সম্পর্কে পরিকার ধারণা ছিল। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ নিয়ে ছিল দ্বন্দ্ব। পরবর্তীকালে এ্যাকাডেমিশিয়ানদের মধ্যেও আমরা এ দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। বিশেষ করে চীনকে সমর্থন করা না করা নিয়েই টানাপোড়েনটা বেশি ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে

প্রকাশিত, কবি সমর সেন সম্পাদিত চৱম বামপন্থী পত্ৰিকা প্রকাশন দুটি চিঠিৰ উল্লেখ কৰিছি, একজন লিখেছিলেন-

‘যতোই এ বিষয়ে বিশ্বেষণ কৰুন না কেন, অস্বীকার কৰার উপায় নেই যে, চীন ইসলামাবাদেৱ শাসকগোষ্ঠীৰ পক্ষ নিয়েছে, বাংলাদেশেৱ ৭৫ লক্ষ মানুষেৰ পক্ষ অবলম্বন কৰেনি। ইতিহাসেৱ কী পৰিহাস।’ (২৪.৪.১৯৭১)

অন্যজন লিখেছিলেন-

“বাংলাদেশে যা ঘটছে তা পাকিস্তানেৱ অভ্যন্তৰীণ ব্যাপার— এ ঘোষণাৰ মাধ্যমে চীন বাস্তবে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদীদেৱ অনুপ্রবেশেৰ বিৱৰণ কৰছে। এভাৰে চীন বাংলাদেশেৱ বিপ্ৰবকে রক্ষা কৰছে, সুযোগ দিছে নিজস্ব উপাদানে বিকশিত হওয়াৰ।” (৮.৫.১৯৭১)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্ৰ গোড়া থেকেই মুক্তিযুক্তেৰ বিৱৰণ ছিল। সেই সময় ফ্রন্টিয়াৰে বামপন্থী প্ৰবন্ধকাৰ বৰি চক্ৰবৰ্তী লিখেছিলেন— “আমেৱিকা সব সময় পাকিস্তানেৱ পক্ষে, ইয়াহিয়া খান তা জানেন কিন্তু বাংলাদেশেৱ মুক্তিযুক্তারা তা জানেন না। এ কাৰণে পাকিস্তান সব সময় ভাৱতেৱ সঙ্গে সংঘাত এবং এখন পূৰ্ববঙ্গে গণহত্যা নীতি কাৰ্যকৰ কৰে খুন কৰে পার পেয়ে যাচ্ছে।” (২৯.৫.১৯৭১)

সাধাৰণ মানুষেৰ কাছে মনে হয়েছিলো, বাংলাদেশ প্ৰশ্নে পৃথিবী দু'ভাগে ভাগ হয়ে গৈছে। একভাগেৰ নেতৃত্বে পাকিস্তান, চীন, আমেৱিকা ও মুসলিম দেশসমূহ, অন্যদিকে ভাৱত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জোট নিৱেক্ষণ দেশসমূহ। কেনো কিছু দেশ পাকিস্তানেৱ পক্ষে ছিল, কেনো কিছু বিৱৰণ ছিল সে নিয়ে নানা তর্ক চলতে পাৱে কিন্তু বাস্তব ছিল পৰাশক্তিৰ মধ্যে চীন ও আমেৱিকা পাকিস্তানকে সমৰ্থন কৰেছিলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু ভাৱত ও মুক্তিযুক্তকে সমৰ্থন কৰেছিলো।

অনেক অ্যাকাডেমিশিয়ান এ তত্ত্বই বিশ্বাস কৰেন যা লিখেছেন সৈয়দ আনোয়াৰ হোসেন তাঁৰ গ্ৰন্থ বাংলাদেশেৱ স্বাধীনতা যুক্তে পৰাশক্তিৰ ভূমিকায় (১৯৮২)। উপসংহারে তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালে চীন, সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্ৰ অৰ্থাৎ তিনি পৰাশক্তিৰ কেউই ‘বাংলাদেশপন্থী’ ‘বাংলাদেশ বিৱৰণী’ ছিল না সবাই নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনা কৰে অগ্রসৰ হয়েছে। ভাৱতও। “তাদেৱ নীতি নিৰ্ধাৰণে বহুল প্ৰচাৰিত বিভিন্ন আদৰ্শিক মতেৱ কোনো স্থানই ছিল না।”

১৯৭১ সালে বাঙালিৱা নিজেদেৱ স্বার্থ দেখেছে, পাকিস্তান দেখেছে তাৱ স্বার্থ, কিন্তু তাৱ মধ্যে আদৰ্শিক ব্যাপার একেবাৱে থাকে না, তা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় তৃতীয় বিশ্বেৱ মুক্তি সংগ্ৰামকে সমৰ্থন কৰেছে, যেমন, সৌদি আৱব কৰে ইসলামপন্থী দেশগুলিকে। কমিউনিজমেৱ প্ৰভাৱ বলয় বিস্তাৱ কৰাও ছিল এক ধৰনেৱ আদৰ্শিক ব্যাপার। তা বাদ দিলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়াৰ পূৰ্ব পৰ্যন্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুলি প্ৰায় ক্ষেত্ৰে সোভিয়েতেৱ সহানুভূতি লাভ কৰেছে। অনুসৰণ কৰেছে জোট নিৱেক্ষণ নীতি।

অন্যদিকে, আনোয়াৰ হোসেন তাঁৰ গ্ৰন্থে যে বোঝেটো কূটনীতিৰ কথা বলেছেন তা

অনুসরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। খুব কম ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের সময় অস্তী বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে সমর্থন করেছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত আনোয়ার হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েতের 'বোম্বেট' কৃটনীতির একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাতে দেখা যায়, ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্র ৪২টি ঘটনার সঙ্গে আর সোভিয়েত ১৩টি ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এ কথাও বিচার্য যে, যখন পরাশক্তিসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের নীতির রূপ দেয়নি, তখন গণহত্যার শুরুতেই ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন জোরালো ভাষায় এর নিন্দা করেছিলো, যুক্তরাষ্ট্র নয়।

## ছয়

বাংলাদেশে এতদিন ক্লাসরূমে যে ইতিহাস চর্চা হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ বিরোধীদের ভূমিকা হয় উহ্য রাখা হয়েছে অথবা তাদের ভূমিকা খাটো করে দেখানো হয়েছে। এবং সেটি রাজনৈতিক কারণে। আজকের রাজনৈতিক জটিলতার কারণ, বাংলাদেশ বিরোধীদের ভূমিকাটি খাটো করে দেখার কারণে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনেই এক ধরনের রাজনৈতিক মেরুকরণের সৃষ্টি করেছিল। আওয়ামী লীগ ছয় দফার ম্যান্ডেট চেয়েছিল, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছোট ছোট মধ্য বা বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বিরোধী থাকলেও বাঙালির মুক্তির প্রশ্নে বিরোধ ছিল না। অন্যগুলি ছিল ইসলাম নিয়ে বা ধর্মের নামে যারা রাজনীতি করছিল তারা। এর মধ্যে প্রধান ছিল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, নেজামী ইসলাম, পিডিপি প্রভৃতি।

এগুলোর প্রথম সন্তানে যখন হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী তাদের অবস্থান সংহত করে ফেলল তখন ইসলামপন্থী দলগুলি দখলদার বাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে এলো। তারা অথবা পাকিস্তানে ছিল বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগকে মনে করতো হিন্দু ভারতের এজেন্ট এবং বামপন্থীদের ধর্মীয় ও দেশের শক্তি। তাদের স্ট্রাটেজি ছিল স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের দৃঢ়হন্তে দমন করা, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করা এবং যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে সেখানে নিজেদের স্থান করে নেয়া।

দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা কার জন্য তারা প্রতিষ্ঠা করে শান্তি কমিটি, গঠন করে আলবদর ও আল শামস এবং রাজাকার বাহিনী। এ সমস্ত কমিটি ও বাহিনীতে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল জামায়াতে ইসলামের। গোলাম আজমের নেতৃত্বে জামায়াত কর্মীরা প্রতিটি বাহিনীতে যোগ দেয়। মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী ও সবুর খান, নেজামে ইসলামীর ফরিদ আহমদ, পিডিপির নূরুল আমীন প্রমুখ স্বাধীনতা বিরোধীদের [যাদের সাধারণভাবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল দালাল] নেতৃত্ব দেন। তাদের উৎসাহে তাদের দলের কর্মীরা বিভিন্ন বাহিনী ও কমিটিতে যোগ দেয় এবং দখলদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে নয় মাস গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটে অংশ নেয়।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে বা ২৬ মার্চ বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। প্রায় একই সঙ্গে বা তার একটু আগে পাকিস্তান বাহিনী তাদের হত্যায়জ্ঞ ও

ধর্মসের কাজ শুরু করে। স্বাধীনতা বিরোধী বা দালালদের সঙ্গে হাজারদের বাইরের নীতি নির্ধারকদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তানী ট্যাংকের গোলা নিষ্কেপ তাদের মনে দারুণ উল্লাসের সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের মতো তারাও মনে করতেন, কয়েক হাজার হত্যার পর বাঙালিরা স্তুক হয়ে যাবে। তখন পাকিস্তানীদের সহযোগী হিসেবে তারাই ক্ষমতায় আসবেন। উল্লেখ্য এদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া, বাকী কেউ কখনও নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি।

পাকিস্তানী বা তাদের সহযোগী দালালরা যা ভেবেছিল তা কিন্তু হয়নি। গণহত্যার খবর চাপা দেয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, কয়েকদিনের মধ্যে সে খবর ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বিশ্বে। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খান আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে। ফলে, তার পক্ষে গণহত্যা সম্বন্ধে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো। নিজের বা পাকিস্তানের ইমেজ ফিরিয়ে আনার জন্য দরকার ছিল কিছু কর্মতৎপরতার। তাদের ধারণা হলো, বাঙালি রাজনীতিবিদরা তাদের সঙ্গে আছেন এ ধারণা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের দিয়েই বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দক্ষিণপশ্চী বাঙালি রাজনীতিবিদরাও তাই চাচ্ছিলেন। কারণ, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এই যোগাযোগকে ভেবেছিলেন তারা প্রথম পদক্ষেপ।

রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা চলে যেতে চাননি। কারণ, পাকিস্তানী আদর্শ ও কেন্দ্রের সেনাবাহিনীর শক্তি তাদের কাছে ছিল অজ্ঞয়। তাদের মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের আদর্শ জয়ী হলে তাদের স্থান হবে বিপন্ন। যে রাজনীতি করে তারা ক্ষমতার অংশীদার বা কায়েমী স্বার্থের অংশীদার হয়েছিলেন সেটি থাকবে না। নতুন বাংলাদেশে তাদের স্থান থাকবে না। এর চেয়ে পাকিস্তানে অধস্তুন হিসেবে ক্ষমতার সহযোগী হওয়া ছিল শ্রেয়। এখানে আদর্শ বা ধর্মের প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু সেটি গৌণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কি মুসলমান ছিল না? বা ইসলামে বিশ্বাস করত না? তবে, ধর্মটিকে ঢাল হিসেবে রাখা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। তারা যা করেছে তা কি ইসলামি 'দর্শণ অনুমোদিত? ফলে, অন্তিমুরক্ষার জন্য তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যা করার করেছে। ড. সাজ্জাদ হোসায়েনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সাধারণ আল-বদরের মতো অস্ত্রহাতে ঘোরা। কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। ফলে, যার যার অবস্থান থেকে সে সে কাজ করে গেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানি দালালদের, দালালদের মধ্যে অবস্থাগত কারণে আবার বিভিন্ন গ্রন্থের। এর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও ফ্যাসিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জামায়াত ইসলাম ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রসংঘ। পাকিস্তানের অ্যাকাডেমিশিয়ান আবাস রশীদ 'পাকিস্তান: মতাদর্শের পরিধি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন- "উলেমাগোষ্ঠীর নিকট আইডের খানের নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনী এবং সন্তানপশ্চী সংগঠনের মাঝে অসম হলেও পারস্পরিক ফলপ্রসূ সম্পর্কে গড়ে উঠে। তবে, সন্তানপশ্চীদের প্রতিনিধি হিসেবে অগঠিত, অসংঘবদ্ধ উলেমাগোষ্ঠী নয়, বরং তাদের স্থান ইতিমধ্যে দখল করে নেয় সুসংগঠিত জামাত-ই-ইসলামী।" জামাত-ই ইসলামীর নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের

সামরিক বাহিনীর খৎসনাজ্ঞকে কেবল সমর্থনই করে। এই প্রকাশনা শাস্তি কর্মিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক সৃষ্টি এই শাস্তি বাহিনীর দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহ দমনে সামরিক কর্মকর্তাদের সহায়তা করা। আদর্শগত পর্যায়েও জামাত-ই ইসলামীর সমর্থন দুর্চিন্তাগ্রস্ত সামরিক বাহিনী স্বাগত জানিয়েছিল সর্বান্তরণ।” তাই আমরা দেখি, আল-বদর ও আল-শামসদের মধ্যে জামায়াতের কর্মই বেশি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জন বাঙালি রাজনীতিবিদ টিক্কাখানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। টিক্কা খানও সানন্দে রাজি হলেন। ৪ এপ্রিল ১২ জন আওয়ামীলীগ বিরোধী নেতা টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করলেন। নেতৃত্ব দিলেন পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন গোলাম আজম, ফরিদ আহমদ, খাজা খয়েরউদ্দিন, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান (দৈনিক ইনকিলাবের মালিক, বর্তমানে মৃত) প্রমুখ।

আলাপ আলোচনার পর প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে “অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নাগরিক কর্মিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়।”

টিক্কা খান এ প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করে “দুর্কৃতকারী ও সমাজ বিরোধীদের [অর্থাৎ যারা বাংলাদেশ ঢায়] আশ্রয় না দেওয়া এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে এদের সম্পর্কে সংবাদ পৌছে দেয়ার” আহবান জানান। শুধু তাই নয় তাদের “শুধু বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের অথ তা রক্ষায় ফলপ্রসূ কাজ করতে নির্দেশ দেন।”

পাকিস্তানিরা চেয়েছিল, তাদের পক্ষের সবাই একই প্র্যাটফরমে কাজ করবে। কিন্তু বাঙালি বিরোধী অনেকে এক সঙ্গে কাজ করতে রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে দলের ফরিদ আহমদ ও নূরুজ্জামান, গোলাম আজম বা জামায়াতের সঙ্গে একই প্র্যাটফরমে এসে কাজ করতে রাজি ছিলেন না। ফলে ৬ এপ্রিল গোলাম আজম আবার টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামীর মুখ্যপত্র দৈনিক সংগ্রামে সামরিক বাহিনীর একটি বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশিত হয়-

“পূর্ব পাকিস্তানের আরো কয়েকজন নেতা গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ‘গ’ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ সমগ্র প্রদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আজম, জায়াত ওলামায়ে ইসলামির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি পীর মহসীন উদ্দিন আহমেদ এবং একজন নেতৃস্থানীয় এডভোকেট এ-কে সাদিক (হবে সাদি) পৃথক পৃথকভাবে জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অ্যাচিত হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

করেন। তাঁরা বলেন যে, প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ ভারতের সুরাম্বাদকে বাসচাল করার জন্য সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করবেন।”

একই দিন পত্রিকায় ‘স্বাভাবিক জীবনযাত্রা’ শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়তে শান্তিকমিটি গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়-

“বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সমন্বয়ে শান্তিকমিটি গঠন এ ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। এ ধরনের শান্তি কমিটি যেমন দুর্কৃতিকারীদের হাত থেকে শান্তিকামী নাগরিকদের জান-মাল রক্ষার কাজে সহায়তা করতে পারবে। অপরদিকে তেমন দেশ ও জাতির স্বার্থবিবোধী যে কোনো মহলের যেকোনো প্রচেষ্টার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সুতরাং প্রতিটি বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিককে এ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করা উচিত।”

শান্তিকমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের পক্ষে যারা আছেন তাদের নিধন করা। পরের দিন জামায়াত নেতা গোলাম আজম, নুরুজ্জামান ও গোলাম সরোয়ারের একটি বিবৃতিই তা প্রমাণ করে। দীর্ঘ বিবৃতির শেষে তারা উল্লেখ করেন-

“ভারতীয়দের জানা উচিত। এ দেশের জনগণ সশন্ত অনুপ্রবেশকারীদের কখনো আগকর্তা হিসেবে মনে করেন না। পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ সশন্ত অনুপ্রবেশকারীদের কোন স্থানে দেখামাত্র খতম করে দেবে বলে তারা দৃঢ় আঞ্চ পোষণ করেন।”

চিন্তা খান ৯ এপ্রিল প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার পরপরই ১৪০ সদস্যের ‘ঢাকা নাগরিক শান্তিকমিটি’ গঠিত হয়। তবে, এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিল-

“ঢাকার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গতকাল শনিবার ১৪০ সদস্যের একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করা হয়েছে। .... গতকাল কমিটির বৈঠকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্ণজ হস্তক্ষেপ এবং পূর্ব পাকিস্তানে সশন্ত অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করা হয়।... বৈঠকে আরও বলা হয়, ভারত পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে আগুন নিয়ে খেলা করছে।....

পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়েরউদ্দিনকে কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে। কমিটিতে যে সকল নেতৃবৃন্দ রয়েছে তারা হলেন, জনাব একিউএম শফিকুল ইসলাম, মৌলভী ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম আজম, পীর মোহসেন উদ্দিন, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব এএসএম সোলায়মান, জনাব আবুল কাসেম এবং জনাব আতাউল হক খান প্রমুখ।

নাগরিক শান্তিকমিটি আগামী মঙ্গলবার ঢাকায় এক মিছিল বের করবে। মিছিলটি ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করবে।”

শান্তি কমিটি থেকে পরবর্তীকালে ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে আরেকটি ‘শান্তি ও কল্যাণ কমিটি’ গঠিত হয়। কিন্তু মূল কমিটি আগেরটিই থেকে যায়। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতে ১৪০ জন সদস্য থাকলেও গোলাম আজমের নেতৃত্বে তা পরিচালিত হয়। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ও কমিটি গঠিত হওয়ায় তৃণমূল পর্যন্ত গণহত্যা, ধর্ষণে হানাদাররা তাদের সহায়তা পায়। জমি দখল, স্বাধীনতাকামীদের ধরিয়ে দেয়া প্রয়োজনে হত্যা, লুট

এরপর ছিল রাজাকার। আসলে এর শুরু উচ্চারণ ‘রেজাকার’-ফারসি শব্দ। ‘রেজা’ হল স্বেচ্ছাসেবী, ‘কার’ অর্থ কর্মী। এক কথায় স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে মিলনে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেয়া হয়েছিলো রেজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত নেতা এ. কে. এম. ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সূত্রপাত করেন। একান্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় গ্রহের তথ্য অনুযায়ী, ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত গ্রহ অনুযায়ী—“প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত: যারা ‘পাকিস্তান’ ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঞ্ছিল হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়ত: যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়ত: গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়—এ ধরনের লোককে প্রলুক্ককরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।”

রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেয়া, মুক্তিবাহিনীর খোজ খবর প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের আমেগঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঞ্ছিলদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের নিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত একান্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় শীর্ষক গ্রহে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আমি সেই গ্রহ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় মাত্র উল্লেখ করবো।

“মে-জুন মাস থেকে রাজাকারদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তিবাহিনী আবেদন নিবেদন শুরু করে। মরহম হাফেজী হজুর, ‘মওলানা’ সিদ্দিক আহমদ, ‘মাওলানা আজিজুর রহমান নেসারবাদী প্রমুখ এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে থাকেন। সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খান আনসারদের রাজাকার পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জুন মাসে ‘পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ১৯৭১’ জারি করে। এ ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে গঠিত আনসার বাহিনী বিলুপ্ত করা এবং সে বাহিনীর সম্পত্তি, মূলধন ও দায় এবং রেকর্ডপত্র রাজাকার বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। আনসার বাহিনীতে তখন পর্যন্ত থেকে যাওয়া এ্যাডজুট্যান্টদের রাজাকার এ্যাডজুট্যান্ট নিযুক্ত করা হয়। এ অর্ডিন্যান্সে আরও বলা হয়, প্রাদেশিক সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করা হবে তাদের ট্রেনিং ও অন্তর্শস্ত্রে সজ্জিত

করা হবে এবং নির্ধারিত ক্ষমতাবলে রাজাকাররা তাদের দায়িত্ব প্রদান করবে।

আনসার বিলুপ্ত করে রাজাকার বাহিনী গঠনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল আনসারে ভর্তি ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত কড়াকড়ি ও বাধ্যবাধকতা ছিল তা দূর করা, যাতে যে কেউ রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখাতে পারে। এর ফলে অতি দ্রুত সারাদেশের স্থানীয় গুগা, টাউট ও মাদরাসা ছাত্ররা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অবস্থায় পূর্বতন এ্যাডজুট্যান্টদের ওপর এই বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে রাখতে শান্তি কমিটি অনীহা প্রকাশ করে। ফলে পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রফুন্ট ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা নেতৃত্বস্বরূপে স্ব-স্ব জেলার রাজাকার বাহিনী প্রধান করা হয়। ছাত্রসংঘ নেতা মোহাম্মদ ইউনুসকে রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়। রাজাকার বাহিনীর নেতৃত্বস্বরূপে শান্তি কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য পেশ করত এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এবং ক্যাম্পাসের অন্যান্য মাঠগুলোকে রাজাকারদের প্রধান প্রশিক্ষণ স্থল করা হয় পি পি পি নেতাদের রাজাকার সমালোচনার প্রতিবাদে জামায়াতী নেতাদের ২৮ নভেম্বর তারিখে বক্তব্য থেকে জানা যায় কোম্পানি কমান্ডার পর্যন্ত জুনিয়র নেতৃত্ব ছিল রাজাকারদের নিজেদের, এর ওপরের নেতারা ছিল ছাত্রসংঘ কর্মীবৃন্দ। এরা একই সাথে ছিল রাজাকার এবং আল-বদর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এদের ট্রেনিং দেওয়া হত। ঢাকায় এই উচ্চপদস্থ রাজাকারদের ট্রেনিং মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংগঞ্চ মাঠ এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের আল-বদর হেডকোয়ার্টারের মাঠে অনুষ্ঠিত হত।

আগস্টের শুরুর দিকে রাজাকার বাহিনী মোটামুটিভাবে একটি আধাসামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়। এ সময় এদের সাংগঠনিক পরিচয় দিতে ১৪ আগস্ট 'আজাদী দিবসে' শান্তি কমিটির মিছিলের আগে আগে কুচকাওয়াজকারী রাজাকার দলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১৫ আগস্ট দৈনিক পাকিস্তানে এই মিছিলের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, 'মিছিলে কয়েকশত পুরো ইউনিফর্ম, বাহতে ব্যাজ, মাথায় সবুজ টুপিধারী সশস্ত্র রাজাকার দৃশ্য পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যায়।'

রাজাকার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য ১৭ অক্টোবর চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য আবুল কাসেম, বলেন, 'ট্রেনিংপ্রাণ্ড ও প্রয়োজনীয় অন্ত্রে সজ্জিত রাজাকারের সংখ্যা এখন ৫৫ হাজার। রাজাকারদের সংখ্যা ১ লক্ষে বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে পর্যাপ্ত রাজাকার মোতায়েন করা হবে, এছাড়া পুলিশ বাহিনী তো থাকবেই।'

রাজাকার বাহিনীও এসময় সাংগঠনিকভাবে এত শক্তিশালী হয় যে ২৩ নভেম্বর রাজাকার ডিরেকটরেটের এক হ্যান্ড আউটে রাজাকারদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে মুজাহিদদের সমান করার কথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয় নয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজাকাররা সেনাবাহিনী ও মুজাহিদের মতো ফ্রি রেশন পাবে। ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজাকারদের বেতনের হার নির্ধারণ করা হয়।

কোম্পানি কমান্ডার রেশনসহ ৩০০ টাকা ও রেশন ছাড়া ১৩৫ টাকা ও রেশন ছাড়া ১৮০ টাকা; সাধারণ রাজাকার রেশনসহ ৫৭ টাকা ও রেশন ছাড়া ১২০ টাকা। সে সময়কার দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী এই উচ্চ বেতনে নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বিপুল সংখ্যায় রাজাকারে ভর্তি হতে প্রস্তুত করতে।

রাজাকার বাহিনীতে নানা শ্রেণীর লোক ভর্তি হলেও এর মূল নেতৃত্ব ছিল জামায়াতের হাতে। ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা প্রধানরা ছিল স্ব স্ব জেলার রাজাকার প্রধান। সে সময় রাজাকারদের সমালোচনার জবাব-ও সে কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় অংশ বিশেষ উদ্ভৃত হতে পারে-

..... ঠিক এ কারণেই পাকিস্তানী বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ, ও আল বদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন করছে। পাকসেনা নায়করা মাঝ সরকার রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত।"

১৯৭১ সালের এপ্রিলে শেষের দিক থেকে আলবদর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কালক্রমে জামায়াত ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রসংঘকেই আলবদরে রূপান্তর করা হয়।

আলবদর গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন হানাদার বাহিনীর মেজর রিয়াদ হসাইন। তিনি বলেছেন, আলবদর নামেই সংঘের তরুণদের সংগঠিত করা হয়। আগস্টের মাসের মধ্যেই পুরো ছাত্রসংঘকে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়। গবেষক রেজা নসর জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইসলামী জনিয়ত ই তুলাবা (পাকিস্তান ছাত্রসংঘ) আলবদর ও আলশামস নামে দু'টি প্যারামিলিটারি ইউনিট গঠন করে।

আলবদরের প্রায় সব সদস্য ছিল তৃণাবক্ত। সে কারণে ছাত্রসংঘের নেতৃত্বাই ছিল আলবদর আলশামসের কমান্ডার। এ ছাড়া তৃণমূল পর্যায় বা অপারেশন পর্যায়ে কমান্ডার ছিল। এবং এ কারণেই তুলাবার তৎকালীন নাজিম ই আলা প্রধান) মিডিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদরদের প্রধান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রসংঘের প্রধান হওয়ার কারণে আলী আহসান মুজাহিদ রূপান্তরিত হন পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে। নিজামী এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘের সদস্যরাও এই দুই ইউনিটের সদস্য ছিল। তিনি লিখেছেন, "বিগত দু'বছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। সারা পাকিস্তানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদয়াপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশি।" (দৈনিক সংগ্রাম, ১৪.১১.১৯৭১]

আলবদররা যে ভালো কাজ করছে সে সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছিল জামায়াতের মুখ্যপত্র দৈনিক সংগ্রাম-'দেশের প্রতিরক্ষা ও দুশ্মনদের সমুচ্চিত শান্তি দেবার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। শান্তিকমিটির কর্ম তৎপরতা এবং দুশ্মনদের উপর রেজাকার ও বদর বাহিনীর মারণাঘাত সে সচেতনতা বোধেরই বাস্তব

কোম্পানি কমান্ডার রেশনসহ ৩০০ টাকা ও রেশন ছাড়া ১৩৫ টাকা ও রেশন ছাড়া ১৮০ টাকা; সাধারণ রাজাকার রেশনসহ ৫৭ টাকা ও রেশন ছাড়া ১২০ টাকা। সে সময়কার দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী এই উচ্চ বেতনে নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বিপুল সংখ্যায় রাজাকারে ভর্তি হতে প্রস্তুক করতে।

রাজাকার বাহিনীতে নানা শ্রেণীর লোক ভর্তি হলেও এর মূল নেতৃত্ব ছিল জামায়াতের হাতে। ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা প্রধানরা ছিল স্ব স্ব জেলার রাজাকার প্রধান। সে সময় রাজাকারদের সমালোচনার জবাব-ও সে কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় অংশ বিশেষ উদ্ভৃত হতে পারে-

..... ঠিক এ কারণেই পাকিস্তানী বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ, ও আল বদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন করছে। পাকসেনা নায়করা মাঝ সরকার রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত।"

১৯৭১ সালের এপ্রিলে শেষের দিক থেকে আলবদর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কালক্রমে জামায়াত ইসলামীর ছাত্রসংঘকেই আলবদরে রূপান্তর করা হয়।

আলবদর গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন হানাদার বাহিনীর মেজর রিয়াদ হ্সাইন। তিনি বলেছেন, আলবদর নামেই সংঘের তরুণদের সংগঠিত করা হয়। আগস্টের মাসের মধ্যেই পুরো ছাত্রসংঘকে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়। গবেষক রেজা নসর জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইসলামী জনিয়ত ই তুনাবা (পাকিস্তান ছাত্রসংঘ) আলবদর ও আলশামস নামে দু'টি প্যারামিলিটারি ইউনিট গঠন করে।

আলবদরের প্রায় সব সদস্য ছিল তৃণাবন্ধ। সে কারণে ছাত্রসংঘের নেতৃত্বাই ছিল আলবদর আলশামসের কমান্ডার। এ ছাড়া তৃণমূল পর্যায় বা অপারেশন পর্যায়ে কমান্ডার ছিল। এবং এ কারণেই তুলাবার তৎকালীন নাজিম ই আলা প্রধান) মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদরদের প্রধান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রসংঘের প্রধান হওয়ার কারণে আলী আহসান মুজাহিদ রূপান্তরিত হন পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে। নিজামী এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘের সদস্যরাও এই দুই ইউনিটের সদস্য ছিল। তিনি লিখেছেন, "বিগত দু'বছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। সারা পাকিস্তানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদযাপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশি।" (দৈনিক সংগ্রাম, ১৪.১১.১৯৭১]

আলবদররা যে ভালো কাজ করছে সে সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছিল জামায়াতের মুখ্যপত্র দৈনিক সংগ্রাম-'দেশের প্রতিরক্ষা ও দুশ্মনদের সমুচ্চিত শান্তি দেবার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। শান্তিকমিটির কর্ম তৎপরতা এবং দুশ্মনদের উপর রেজাকার ও বদর বাহিনীর মারণাঘাত সে সচেতনতা বোধেরই বাস্তব

স্বাক্ষর বহন করছে। আমাদের সশঙ্খ বাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক প্রাত়িরোধ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক এ কামনাই আমরা করি।' (দৈনিক সংগ্রাম, ৬.৯.১৯৭১)

৭ই নভেম্বর আলবদর দিবস পালন করা হয়। 'আলবদর দিবস উপলক্ষে গতকাল রোববার ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে এক বিরাট ছাত্র গণ-মিছিল বের করা হয়। পৰিত্র রমজানের মধ্যে গতকালই প্রথম আলবদরের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত মিছিলকারীদের পদভাবে রাজধানীর রাজপথ প্রকল্পিত হয়ে ওঠে'। [সংগ্রাম, ৮.১১.৭১] সেখানে বক্তৃতা করেন, ছাত্রসংঘের ঢাকা শহরের সভাপতি শামসুল হক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রসংঘের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মীর কাসেম আলী।

এখানে উল্লেখ্য এর চার বছর পর, বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে হত্যার পর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ৭ই নভেম্বর সংঘটিত হয় 'সিপাহী বিপ্লব'। বলা যেতে পারে তা ছিল নতুনভাবে আলবদর দিবস পালন। আলবদর দিবস কিন্তু আলবদর নামে কেউ বক্তৃতা দেয়নি কেন? কারণ, ছাত্রসংগঠনইতো তখন আলবদর, এর নেতারাই আলবদরের নেতা।

আর একটি উদাহরণ দিয়েই এ পর্ব শেষ করব। রাজাকার আলবদরদের হিংস্রতায় খুব সম্ভব আশঙ্কিত হয়ে হানাদার বাহিনীর সহযোগী ফুলফিকার আলী ভুট্টো, কাওসার নিয়াজী ও মুফতি মাহমুদ বোধহয় কিছু মন্তব্য করেছিলেন [জমিয়াতে তুলাবার শক্ত ঘাঁটি ছিল লাহোরে। হয়ত তারা আশঙ্কা করেছিলেন পাকিস্তানেও তুলাবা একই কাও শুরু করতে পারে]। এ কারণে আলী আহসান মুজাহিদ ক্ষিণ হয়ে এক বিবৃতিতে ১৫ অক্টোবর বলেছিলেন-'পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক যুবকেরা ভারতীয় চরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জাতির সেবা করছে। অথচ, সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা জনাব জেড এ ভুট্টো, কাওসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ ও আসগর খান রাজাকার আলবদর ও অন্যান্য দেশ হিতৈষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিষেদগার করছেন। এসেব নেতার এ ধরনের কার্যকলাপ বক্ত করার জন্য এবং এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।' সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আলবদর বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেন। [সংগ্রাম, ১৫.১০.১৯৭১]

১৯৭১ সালের মে মাসেই আলবদর বাহিনী হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী বাহিনী হিসেবে গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার থেকে আলবদর বেতন পেত।

আলবদররা মে মাস থেকেই 'দুর্কৃতিকারি' দমনের নামে হত্যা শুরু করে। তাদের বিশেষ টাক্কেটি ছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। ১৪ ডিসেম্বর এ কারণে বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশকে বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর তাই বুদ্ধিজীবী হত্যাদিবস, গণহত্যাকে স্মরণ করেই।

বুদ্ধিজীবী কারা? বাংলা একাডেমী, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ

করেছে তাতে বুদ্ধিজীবীদের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে আল-বদর বাহিনী। Android Coding Bd  
‘বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী চিকিৎসক, কঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।

পাকিস্তানীরা বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করেছিল কেন? এর একটি কারণ পাকিস্তানী শাসকচক্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উথান ও প্রভাবকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের ধারণা ছিল, এ শ্রেণীর প্রেরণাদাতা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীরা। জেনারেল ফজল মুকিম খান ১৯৭৩ সালে লিখেছিলেন, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ঘাটের দশকে সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে প্রভাবিত করে তোলে পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে। এ কথাগুলো সত্যি, যে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, এমনকি ১৯৭১ থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংস্কৃতিসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের অনেকেরই চোখে তা এড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানীরা তা ঠিকই পর্যবেক্ষণ করেছে। ফলে, একধরনের বিশেষ ক্ষেত্র ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

অপর আরেকটি কারণ হলো যদি, বাঙালিরা জিতেই যায় তারা যেন নেতৃত্বহীন থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ‘কোষগ্রস্থ’-এ যে যুক্তি দেয়া হয়েছে তা মুক্তিযুক্ত-‘এটা অবধারিত হয়, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়গুলোতে পাঠদানে, চিকিৎসা প্রকৌশল রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সামৰিদ্ধে এসে। একটি জাতিকে নিবীর্য করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেয়া। ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিত, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।’

‘স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সি.আই.এ-চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল-বদরবাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ-সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সজ্ঞাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামাতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় জামাতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচারপত্রের ভাষা হলো: বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধু-দেশ।’

[একান্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায় থেকে উদ্ভৃত]

বুদ্ধিজীবী হত্যায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল আল-বদরবাহিনী। সারা পাকিস্তান আল-বদরবাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আল-বদর হাইকমান্ডের যারা এখন স্বাচ্ছন্দে টাকা-পয়সা করে রাজনীতি করছে তাদের মধ্যে নিজামী ছাড়াও আছে জামাতের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, মোহাম্মদ ইউনুস,

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মেহেমান আবদুল হক, মুফত মুহাম্মদ কুদুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ। জেনারেল জিয়া ওদের পুনর্বাসিত করেন।

এদের মধ্যে আরো ছিলো খালেক মজুমদার, ‘মওলানা’ মাল্লান, আবদুল আলীম, চৌধুরী মঙ্গলনুদ্দিন প্রমুখ। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায় এরকম অনেক ছোট আলবদর ছিল [সংকলন দেখুন]। আল-বদরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। জানার বা তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টাও করা হয়নি। ১৪-৯-৭১ তারিখে জামাতের মুখ্যপত্র সংগ্রামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে লেখা ছিল-

“আল-বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল-বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর যেখানেই। সেখানেই দুর্ভুতকারী আল-বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুর্ভুতকারীদের কাছে আল-বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।” আল-বদর ও আল-শামস গঠিত হয়েছিল প্রধানত জামাতে ইসলাম ও ছাত্র শিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা। সারা বছর ধরে তারা হত্যাকাও চালালেও পরাজয় আসল জেনে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তারা মরণ-কামড় দেয়। এ সম্পর্কে সে-সময়কার দৈনিক বাংলায় ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রতিবেদন-

“এই নৃশংস হত্যাকাও চালিয়েছে গত সপ্তাহ ধরে জামাতে ইসলামীর আল-বদর। ‘শহরের কয়েকশ’ বুদ্ধিজীবী ও যুবককে এবা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে।”

‘গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমাড় এলাকার বিভিন্ন গর্ত হতে বহসংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক ডাঙ্কার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ পর্যন্ত কতিপয় বাজিয়ে লাশ শনাক্ত করা গেছে। অনেক লাশই বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নাই। গত এক সপ্তাহে যতজন নিখোঁজ হয়েছেন অনুমান করা হচ্ছে যে, এদের একজনকেও আল-বদর রেহাই দেয়নি।

‘ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর ছাত্রসংস্থা ইসলামী ছাত্রসংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আল-বদর সেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এক সপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবককে ধরে নিয়ে যায়।’

আলবদরদের হিস্তার দু'টি বিবরণ দিয়ে শেষ করব। ১৬ ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হলে আলবদরদের দ্বারা অপহৃতদের লাশ খুঁজতে বের হন আত্মীয় স্বজনরা। প্রধানত: রায়ের বাজার এবং মিরপুরের সেলে অগণিত লাশ, কংকাল, লেখিকা হামিদা রহমান ১৬ ডিসেম্বর রায়ের বাজার ঘুরে এসে লিখেছিলেন-

“আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা-বাঁধা।...

“আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই কে যেন অন্ত দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা.... মেয়েটি সেলিনা পারভীন।

শিলালিপির এডিটর।.....

“মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে হাজার হাজার মাটির তিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল নাক্ষা দিচ্ছে কত লোককে যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।”

তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের একটি বিবরণ (বঙ্গানুবাদ)-.... বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরের মধ্যবিস্তুদের আবাসিক এলাকা ধানমন্ডির কাছে একটি ইটখোলা এটি একটি অস্ত্রুত নির্জন জায়গা; যদিও নীলচে-শাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরিপানা ভেসে বেড়ায়। ‘শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন। মৃতদেহগুলো দেখার জন্য কাদামাটির পথ ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।’

.... এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা এখনো শুয়ে আছেন; তাদের শরীরের ওপর জমেছে ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাঁধের ওপর একটি কঙ্কাল পড়ে রয়েছে; ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে দেহটিকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে।

‘বাঙালি জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অস্ত্রুত শাস্তি ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদেরকে ক্রোধাব্িত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধন্যাস্ত। কিন্তু এখানে তারা হাঁটছে, মুদু ফিসফিস করে কথা বলছে, তারা যেন গির্জা পরিদর্শনরত পর্যটক।’

রাজাকার, আলবদর, শাস্তি কমিটির সদস্য, ইসলামপাঞ্জি বলে কথিত পাকিস্তান সমর্থন রাজনৈতিক দল জামায়াত, মুসলিম লীগ প্রভৃতি এভাবে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে একান্তরের নয়মাস বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। বাঙালি জাতির কলঙ্ক এরা। ১৯৭২ সাল থেকে সরকার এদের বিচারের আওতায় আনে। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শহীদ হলে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তিনি রাজাকার, দালাল, আলবদর, জামায়াত ইসলাম প্রভৃতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন ও দণ্ডিতদের মুক্তি দিয়ে আবার রাজনীতি করার সুযোগ দেন এবং তাদের ক্ষমতায় আনেন সমস্বয়ের রাজনীতির নামে। এ ভাবে ১৯৭১ জাতির ঐক্যবন্ধ বাঙালি জাতিকে দ্বিষণ্ঠিত করার প্রয়াস নেন এবং সফল হন।

এদের মধ্যে যারা যুদ্ধাপরাধী তাদের শাস্তির দাবিতে গত চারদশক আন্দোলন হয়। বাঙালি জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য ২০১১ সালে গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আবদুল আলীম, কাদের মোল্লা প্রমুখ যুদ্ধাপরাধীদের বিচর শুরু হয়েছে।

## সাত

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকে ঘ্রেফতার করে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানের লায়ালপুরে। সেখানে কারাগারে এক ফাঁসির প্রকোষ্ঠে তাকে রাখা হয়।

প্রথমদিকে সবার ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু জীবিত আছেন। পরে পাকিস্তানে সংবাদপত্রে তার ছবি দেখে সবাই জানলেন তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। তখন থেকেই তাঁর

মুক্তির দাবি জানানো শুরু হয়। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান একটি মুক্তি প্রস্তাৱ করে বঙ্গবন্ধুকে বিচার, হত্যার হৃষিকি দিতে থাকেন।

জুলাই মাসে ইয়াহিয়া খান এক সংবাদদাতাকে বলেন, “শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত এবং পাকিস্তানের যে কোনো কারাগারে আছেন। তবে আজকের পর কাল শেখ মুজিবের জীবনে কী ঘটবে সেটা আমি হলফ করে বলতে পারব না। তার বিচার করা হবে এবং এর মানে এই নয় যে, আগামী কালই আমি তাকে গুলি করে হত্যা করার। তার স্বাভাবিক মৃত্যু ও ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার কী বা করার আছে? সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করার জন্য আমার জেনারেলরা চাপ দিচ্ছেন। আমি সম্মত হয়েছি। খুব শিগগিরই বিচার অনুষ্ঠিত হবে।”

বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চেয়েছে এবং সে দাবি সব সময় অব্যাহত রেখেছে। ইন্দিরা গান্ধী জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন। সারা বিশ্ব থেকে ইয়াহিয়া খানের প্রতি দাবি জানানো হয় শেখ মুজিবের মুক্তি। এমনকি জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্টও এক বিবৃতিতে বলেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্যে যা ঘটবে তা অবধারিতভাবেই পাকিস্তানের সীমানার বাইরেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

২ আগস্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন ১১ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হবে। তিনি ঘোষণা করেন, “শেখ মুজিবের বিচার করা হবে এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে রাষ্ট্রের আইন অনুসারে তার বিচার হবে।”

গোপন বিচার কক্ষে বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি বেসামরিক লোক অথচ বিচার হবে সামরিক ট্রাইবুনালে এটা বৈধ নয়। আমাকে বা আমার জনগণকে বিচার করার কোনো অধিকার এদের নেই।” বিচার সেদিন স্থগিত করা হয়।

৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর বিচারের নামে প্রহসন চলে এবং বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ইতোমধ্যে যুক্ত শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি উঠতে থাকে। আমেরিকা প্যাস্ট ইয়াহিয়াকে মুজিবকে হত্যা করতে নিষেধ করে। এরপর পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে। আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে তিনি ফিরে আসেন দেশে।

## আট

মুক্তিযুদ্ধ সফল হতো না যদি না সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করতেন। মুক্তিযুদ্ধে এতো দ্রুত বাঙালিরা জয় লাভ করতেন না যদি না প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ ও ভারত অবদান রাখত।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর সংব্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। হত্যা, তারা হয়ত ভাবেনি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী বাঙালি দালালরা এমনভাবে গণহত্যায় মেতে উঠবে। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে বাঙালি তারপর প্রস্তুতি গ্রহণ করে যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

২০ মার্চের পর এক কোটি মানুষ বাস্তিটা ত্যাগ করে আসে। এই কোটি দেশে থেকে যান। অবরুদ্ধে বাংলাদেশে তারা এমন এক আতঙ্কময় জীবন যাপন করেন যা অন্তত যারা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন তাদের ছিল না। অহর্নিশ তারা পরিবার পরিজন নিয়ে সজ্জন্ত থাকতেন। যাদের পরিবারে তরুণ-তরুণী ছিল তারা সব সময়ই মৃত্যুর আশঙ্কা করতেন।

গণহত্যার প্রাথমিক ধার্কা সামলাবার পর অবরুদ্ধ দেশে দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়। একদিকে অফিস আদালত চালু হয়, সংসারের রুটিন কাজ শুরু হয় তবে সারা দেশের অস্বাভাবিকতা বোঝা যেত। শিক্ষালয়গুলি ছিল প্রায় খালি। সঞ্চার পর রাস্তায় লোক চলাচল করতেন না। এক অংশে থেকে আরেক অংশে মানুষজন বেশি যেতেন না। অফিস-আদালতের উপস্থিতি ছিল কম। যে কারণে পাকিস্তান সরকার বিশ্ববাসীর কাছে কখনও প্রমাণিত করতে পারেনি যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক আস্থা বিরাজ করছে।

অন্যদিকে, শরণার্থী হওয়া ছাড়াও তরুণদের একাংশ যাদের মধ্যে ছাত্র-কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণের সংখ্যা ছিল বেশি তারা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যান এবং প্রশিক্ষণ থেকে গেরিলা আক্রমণের জন্য দেশে ফিরতে থাকেন। সাধারণ মানুষজন তাদের আশ্রয় ও খাদ্য যোগাতেন। বিভিন্ন অপারেশনে সাহায্য করতেন, গোপন তথ্য সরবরাহ করতেন। অনেকে গুরুত্ব বস্তু যোগাড় করতেন শরণার্থী, মুক্তিযোদ্ধা ও আহতদের সাহায্যের জন্য। গোপন পত্র-পত্রিকা লিখেই প্রকাশ করতেন সাধারণ মানুষের মনোবল অঙ্গুলি রাখার জন্য। বাঙালি দালালদের কর্মকাণ্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কখনওই যোগ দেননি। এসবই ছিল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয় একটি জনযুদ্ধে।

যে কোন যুদ্ধে নারী সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। মুক্তিযুদ্ধও এর ব্যতিক্রম নয়। নারী ধর্ষিত হয়েছেন, সন্তানহারা, স্বামী হারা হয়েছেন, পরিবারের পুরুষরা যুদ্ধে গেলে সংসার সামলেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়-খাদ্য দিয়েছেন, সেবিকা হিসেবে কাজ করেছেন এবং অনেকে যুদ্ধ করেছেন ও যুদ্ধের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেছেন। প্রবাসেও নারীরা মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান খাটো করে দেখার উপায় নেই। আসলে, সেই সঙ্গে গুটিকয় বাঙালি ছাড়া সবাই মুক্তিযোদ্ধা। একেকজন একে ফ্রন্টে কাজ করেছেন মাত্র। তবে, অবদান বেশি যারা অন্ত হাতে হানাদার বাহিনীও তার সহযোগীদের মোকাবেলা করেছেন।

গণহত্যা যখন শুরু হয় তখন থেকেই প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন [যেখানে বাঙালিরা বেশি ছিলেন] বাঙালিরা একদিকে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। স্মারক লিপি প্রদান করেন, সংসদ সদস্যদের কাছে ধর্ণা দেন অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লন্ডনকে অভিহিত করা হয় মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় যুদ্ধ ক্ষেত্র। ভারতকে দ্বিতীয়, লন্ডনে ইউরোপের

অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিদের এসে মিলিত হতেন। লক্ষ্মি প্রবাসী বাঙালিদের ক্ষেত্রে দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ বাঙালিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ যে ভাবে সমবাণী ছিল আগে তা কোনও দেশের স্বাধীনতার জন্য হয়েছে কি না সন্দেহ। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। কিন্তু সে দেশের নাগরিকরা বাঙালিদের সমর্থন করে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যে মার্কিন সরকার ইচ্ছে থাকলেও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায় নি। যুক্তরাজ্য নাগরিকরা সব সময় রাস্তায় থেকেছেন বাঙালিদের সঙ্গে। পাকিস্তানে সিডিল সমাজের অনেকে বাঙালিদের সমর্থন করতে গিয়ে জেলে গেছেন। ইন্দোনেশিয়ার সরকার ছিল পাকিস্তানের পক্ষে কিন্তু ছাত্র বা বুদ্ধিজীবীরা ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। প্রবাসীদের এই ভূমিকা তেমন ভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। কোথায় ইকুয়েডর সেখানেও একজন পত্রিকায় বাংলাদেশের পক্ষে লিখেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় এক কবি আরো সমব্যক্তিদের নিয়ে বাঙালিশরণার্থীদের জন্য এক মাসেরও বেশি অনশন করেছেন, উদ্দেশ্য অস্ট্রেলিয়া সরকার যেন বাঙালি শরণার্থীদের জন্য দানের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়। বুয়েনস আয়ার্সে নোবেলজয়ী লেখক বোহেস্স, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপুর বুদ্ধিজীবী ভিট্টোরিয়া ওকাম্পো বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল করেছেন। জার্মানীর এক গ্রামে, গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়ে একদিনে বাংলাদেশের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন ৩০ হাজার মার্ক। আনা টেইলর হোয়াইট হাউসের সামনে অনশন করেছেন। বিখ্যাত শিল্পী ভিরমিয়ারের ছবি এক প্রদর্শনী থেকে চুরি করেছিলেন বেলজিয়ামের এক যুবক। ছবির মুক্তিপুণ চেয়েছিলেন বাঙালিদের জন্য। প্যারিসে এক যুবক ছিলতাই করেছিলেন পাকিস্তানের বিমান, সেখানে ছিল ঔষুধপত্র। তার দাবি ছিল তা বাঙালি শরণার্থীদের দিতে হবে। লক্ষনের কাগজে একজন ইংরেজ বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিলেন তিনি যে কোন সাহায্যে প্রস্তুত। জন লেনন ও রবিশক্র নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাঙালিদের জন্য কনসার্টের জন্য আয়োজন করেছিলেন যা ছিল অভূতপূর্ব। জোন বেজ বাংলাদেশের জন্য গেয়েছিলেন। অ্যালেন গিনসবার্গের মতো কবি লিখেছিলেন বাংলাদেশের জন্য কবিতা। চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল ভারতে। ইউরোপে শিশুরা তাদের দুপুরের খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে সাহায্য করেছিল শরণার্থীদের। জাপানের একজন চাকরি ছেড়ে গাড়ি করে সারাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন বাঙালিদের পক্ষে জনমত সংগঠনে। স্বাধীন বাংলা বেতার যদি হয় ১২ নং সেক্টর তাহলে বিদেশী নাগরিক সমাজ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নং সেক্টর। ২০১১-১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার যেসব বিদেশী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অঞ্চলী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা দিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অবদান বিদেশীদের মধ্যে ভারত ও ভারতীয় বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনগণ। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ ছিল কিন্তু বাংলাদেশ প্রশ্নে তারা ছিল একমত। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সর্বক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সাহায্য সহযোগিতাকে গবেষকরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক ফ্রেমের আলোকে বিচার করেছেন। এর মধ্যে প্রাধান্য বিষ্ঠার করে আছে বৃহৎ ও শুল্ক রাষ্ট্র এবং নিজ স্বার্থতত্ত্ব। অর্থাৎ ভারত নিজ স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছেন।

পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজ স্বার্থে কাজ করবে সেটি স্বাভাবিক। ভারত সরকার পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার সুযোগ ছাড়বে না সেটিই সত্য। কিন্তু, প্রশ্ন হলো এ সুযোগ কি ভারত সৃষ্টি করেছে না পাকিস্তান? পাকিস্তান গণহত্যা শুরু না করলে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ভারত যেতো না, আওয়ামী লীগ মুজিবনগর সরকার গড়ত না, মুক্তিযুদ্ধও হতো না। এরপরও কথা থাকে, শুধু নিজ স্বার্থই নয়, বাংলাদেশের মানুষের জন্য সারা ভারত জুড়ে একটি আবেগের সৃষ্টি হয়েছিলো।

বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ শরণার্থী গিয়েছিলেন পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চলে। এসব অঞ্চলের অনেক মানুষ ছিলেন যাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে, আত্মীয়স্বজনও ছিলেন। এ অঞ্চলের ভাষা, খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি প্রায় একই। ফলে, এ গণহত্যা নিজ আত্মীয়কে হত্যা হিসেবে তারা নিয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক মানুষকে আশ্রয়, খাদ্য দেয়ার জন্য সব রকমের সহযোগিতা তারা করেছিলেন।

অন্য দিকে ষাট দশকের মধ্যভাগ থেকে বিশ্বজুড়ে উদারনীতির হাওয়া বইতে শুরু করে। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠে। এর প্রভাব এ অঞ্চলেও পড়েছিলো। যে কারণে, শুধু পূর্বাঞ্চল নয়, সারা ভারত জুড়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাংলাদেশের মানুষের সাহায্যের জন্য পথে নেমেছিলেন। এদের অনেকের বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। এ উদারনীতি ও আবেগের কারণে, অভিনেত্রী ওয়াহিয়া রেহমান মুস্বাইতে সাহায্য তহবিল খুলতে এগিয়ে এসেছিলেন, শিল্পী হ্সাইন ও অন্যান্য শিল্পীরা ছবি বিক্রি করতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে কংগ্রেস সরকারকে তারা চাপ দিচ্ছিলেন বাংলাদেশকে সহায়তা দেবার জন্য। এগ্রিম মাস থেকেই তারা দাবি জানাচ্ছিলেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার।

ভারত সরকার অতোটা আবেগে আপুত হয়নি। তারা তাদের নির্ধারিত পরিকল্পনা ধরে এগিয়েছে। তবে, জনমত সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের পক্ষে থাকায় তাদের সুবিধা হয়েছিলো। সরকার এ জনমতকে পুঁজি করে নিজ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছিলো। ভারতীয়দের এ আবেগ সৃষ্টি না হলে, ভারত সরকারের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হতো না। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তাকে আটোসাটো বিদ্যমান তাত্ত্বিক ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে চলবে না। আর যদি দেখতে হয়, তাহলে সেই তত্ত্বে, জনগণের আবেগও একটি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যারা ছিলাম অবরুদ্ধ বাংলাদেশে, তাদের অধিকাংশের প্রধান প্রার্থনা ছিল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ করে বাঁধবে। আজ চতুর্দিকে পাকিস্তান আমলের মতো ভারত বিরোধিতা দেখি যা বিএনপি ও ডানপন্থি দলগুলি উৎকৃষ্টে

তুলছে। কিন্তু, ১৯৭১ সালে আর্থিতি ছিল ভারত কি আমাদের শরণার্থীদের সাহায্য করবে, অঙ্গ দেবে, থাকতে দেবে? এসব অনুভূতি আজ অনেকেই অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু তাই ছিল সত্য। এবং সেই পটভূমিকায়-ই ১৯৭১ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধকে বিচার করতে হবে।

১৯৭১ সালের আগে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দু'টি বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছিলো। ১৯৬৫ সালে শেষ যুদ্ধের পর তাখখন্দ চুক্তি হয়। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার গঠনের পরই মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত হবেই। এপ্রিল থেকেই, পূর্ব সীমান্তে এক আধটু সংঘাত হচ্ছিলো এবং ক্রমেই সে সংঘাতের সংখ্যা বাড়ছিলো। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত ফাঁড়িগুলি কখনও কখনও দখল করেও নিছিলো এবং পাকিস্তান ভারত-কে দোষী করে আসছিলো। ভারতও যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিছিলো না তা নয়। পাকিস্তানও প্রস্তুতি নিছিলো এবং একসময় তা স্থায়ুর যুদ্ধে পরিণত হয়েছিলো।

### নয়

একদিকে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে চলছে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট। অন্যদিকে, মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ ও সমুখ যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীকে পর্যন্ত করে ইঞ্জিন এগোচ্ছেন। ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহে সুসংবন্ধ আক্রমণ শুরু হলো।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন ও জনসভায় বক্তৃতা দিতে। এ সময়ই তিনি জানতে পারেন পাকিস্তান পঞ্চম সীমান্ত আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লি ফিরে যান ও যুদ্ধের ঘোষণা দেন। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় দুই ঝন্টে যুদ্ধ করার।

পূর্বাঞ্চলে বা মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্পন্ন করার জন্য ভারত ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড। ভারতের সেনাপতি জেনারেল মানেকশ্ব হন যৌথ কমান্ডের প্রধান। পূর্বাঞ্চলের নেতৃত্ব দেন লে. জে. জগজিৎ সি অরোরা। অচিরেই পাকিস্তান বুকাতে পারে এ যুদ্ধে তাদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। অন্য দিকে, পূর্ব সীমান্তে ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী দুর্বারগতিতে অগ্রসর হয় ঢাকার দিকে। একটির পর একটি এলাকা মুক্ত হতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে তারা ঢাকার উপকল্পে পৌছে যায়। ১৬ ডিসেম্বর অপরাজেয় রমনার মাঠে [বর্তমান সোহরাওয়ানী উদ্যান] পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান লে. জে. এ. কে নিয়াজি, যৌথ কমান্ডের কাছে ৯৩ হাজার সৈন্য ও সহযোগীদের নিয়ে আজ্ঞাসমর্পণ করে। বন্ধুত্ব পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে এবং ভারতও পূর্ব সীমান্তে প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে সহায়তা করার সুযোগ পায়। বলা যেতে পারে পাকিস্তান-ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ত্বরান্বিত করে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকার এসে দায়িত্ব গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বাঙালি মুক্তির জন্য তার পরিসমান্তি ঘটে

সরকারের দায়িত্ব ভার গ্রহণে। ও সময়ে দৈনিক আনন্দবাজারের প্রকাশ প্রতিবেদনে লেখা হয়-

“পুরোনো পল্টনের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আজ ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের দশ হাজার কর্মচারী হাত তুলে শপথ নিয়েছেন, বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে দেশ পুনর্গঠনের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী তাজুন্দীনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওরা বলেছেন, ‘তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ’। এই ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের কর্মীরাই গত মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সরকারি প্রশাসন যত্ন অচল করে দিয়েছিলেন। বহু নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের তমসা অতিক্রম করে পুরোনো পল্টনে আবার মুক্তির আনন্দ উভাল হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী তাজুন্দিন, অর্থমন্ত্রী শ্রী মনসুর আলি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক সেক্রেটারিয়েটে উপস্থিত হলে দিকবিদিক প্রতিধ্বনি করে ওরা আওয়াজ তোলে, জয় বাংলা। তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।”

বঙ্গবন্ধু ১০ জুনয়ারি ফিরে এলে মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি হয় বলা যেতে পারে। ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি তুলে বাঙালি যুদ্ধ করেছিল, শহীদ হয়েছিল, ধর্ষিত হয়েছে, লুঁচিত হয়েছে, সন্তানহারা হয়েছে। এতো আত্মত্যাগ খুব কম জাতি করেছে স্বাধীনতার জন্য। তাই বলি, স্বাধীনতা শুধু চার অক্ষরের শব্দ মাত্র নয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক বা বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি মনে রাখলে মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখাটা বোঝা সহজ হবে।

১. অনেক সময় দেখা যায় একটি রাষ্ট্রে যারা সংখ্যায় বেশ [সংখ্যাগরিষ্ঠ] তারা যারা সংখ্যায় কম [সংখ্যালঘু] তাদের দমিয়ে রাখে। তাদের অধিকারে বাধা দেয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টোটা, বাঙালি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের দমিয়ে রেখেছিল অবাঙালি সংখ্যালঘুরা। সংখ্যায় বাঙালিদের যুদ্ধ করে তাদের অধিকার আদায় করে নিতে হয়েছে।

২. পৃথিবীর যে কোটা দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে যুদ্ধ করেছে এবং জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র দেশ।

৩. দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ একমাত্র দেশ না সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে। সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা শুধু যুদ্ধ করেনি, সাধারণ মানুষও যুদ্ধ করেছে। তাই এই যুদ্ধকে বলা হয় জনযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন রাজনীতিবিদরা।

৪. বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যে দেশের নেতা যুদ্ধের সময় অন্য দেশের কারাগারে বন্দী ছিলেন। আমি বঙ্গবন্ধুর কথা বলছি। সেই নেতার নাম নিয়ে মানুষ যুদ্ধ করেছে।

৫. পৃথিবীর আর কোন দেশে [যা এতো ছোট] এতো বড় গণহত্যা চালানো হয়নি। ত্রিশ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে।

৬. আর কোন দেশ এতো অল্পসময়ে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়নি এবং এত হাজার সৈন্য ও কর্মচারির আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেনি।

৭. দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য আর কোথাও এতো বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়নি।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, গোবিন্দচন্দ্র দেব, মুনার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, ডা. আলিম চৌধুরী, নিজামুদ্দিন আহমেদ, সেলিনা পারভীন প্রমুখ বিভিন্ন পেশার মানুষদের হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সৈন্য ও আলবদররা।

৮. স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন এতো লোক একেবারে বিদেশে চলে গেছেন শরণার্থী হয়ে এবং যুদ্ধ শেষে আবার ফিরে এসেছেন-এমন ঘটনাও ঘটেনি।

৯. পৃথিবীর বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলি পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। তারপরও বাংলাদেশের মানুষ এতো অল্প সময়ে জিতেছে এমন ঘটনাও কম ঘটেছে।

১০. শক্র আক্রমণের দু'সপ্তাহের মধ্যে আর কোন দেশ সরকার গঠন করে যুদ্ধ চালাতে পারেনি।

১১. ইসলামের নামে আর কখনও এতোগুলি ইসলামি রাষ্ট্র [পাকিস্তান, সৌদী আরব, মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি] ক্ষুদ্র একটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এতো মুসলমান হত্যার ঘটনা আগে কখনও ঘটায়নি। ইসলামের ইতিহাসে এটি একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা।

বাংলাদেশের স্বপ্ন অনেকে দেখেছেন। কিন্তু হয়ত স্বপ্নই দেখেছেন। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। মুসলিম লীগের রাজনীতি দিয়ে তার যাত্রা শুরু কিন্তু মনে প্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাই ঢাকায় ফিরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধেই তরুণদের সংগঠিত করেন। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ গঠনে ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। যুজ্বল্ট গঠন ও মন্ত্রী হিসেবেও কতটুকু সম্ভব অবদান রেখেছিলেন।

১৯৬৬ সালে তাঁর ঘোষিত ছয় দফা তাঁর এবং পূর্ববঙ্গের রাজনীতির মোড় ঘূরিয়ে দেয়। ছয় দফা কালক্রমে পরিণত হয় বাঙালির মুক্তি সনদে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালি রাজনীতিবিদদের মধ্যে তাঁকেই ভয় এবং সমীহ করতো। কারণ, পদ সম্পদ কোন কিছু দিয়েই তাঁকে কেনা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিকভাবে তাঁকে শেষ করে দেয়ার জন্য ১৯৬৮ সালে তাকে আগরতলা ম. মলায় জড়ানো হয়। ১৯৬৯ সালে জনগণ তাঁকে মুক্ত করে এনে ভালবেসে উপাধি দেয় ‘বঙ্গবন্ধু’।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির নেতা হয়ে উঠলেন। বাঙালি আর কখনও এতো ঐক্যবন্ধ হয়নি। যা হয়েছিল তাঁর ডাকে। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তাঁর নামেই।

১৯৭২-৭৫ তিনি দেশ শাসন করেছেন। এ সময় তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি দেশকে পুর্ণগঠন করা এবং দেশকে মাত্র নয় মাসের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার দেয়া। যে সংবিধানে তাঁর সারাজীবনের আদর্শ, লক্ষ্য বিশৃত হয়েছিল।

তাঁর মতো আত্মাগ খুব বাঙালি রাজনীতিবিদই করেছেন। জীবনের ১১ বছর কেটেছে জেলে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিজেও পাননি। পরিবারকেও দিতে পারেননি কিন্তু নিজ লক্ষ্য থেকে এক চুলও সরেননি। তাঁর আত্মজীবনী ‘অসমাঞ্চ আত্মজীবনী’ একটি অসাধারণ গ্রন্থ। বড় মাপের এই মানুষটিকে বুঝতে হলে তার আত্মজীবনী অবশ্য পাঠ্য।

শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সোনার বাংলা গড়ার জন্য ছিল প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান হতে পারে সংবিধান, নির্বাচন, ভোট, আমলাতঙ্গ, পার্লামেন্ট। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি এসবের কিছু সূচনা করেছিলেন যা সৃষ্টি করতে পারত সিভিল সমাজ আর বাংলাদেশতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সিভিল সমাজ গঠনের জন্যই। এই সিভিল সমাজ ভাঙার কাজটি শুরু করেছিলেন জে. জিয়া, যাতে সমাজে অন্ধধারীদের প্রভাব থাকে, জে.এরশাদ সে কাজটি করেছিলেন সম্পর্ক এবং এখনো তা থেকে আমরা মুক্ত নই এবং সে কারণেই আবার ফিরে আসছেন আলোচনায় বার বার বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিব হত্যাকাণ্ড তো একমাত্র তুলনীয় হতে পারে হানাদার বাহিনীর হত্যাখণ্ডের সঙ্গে। বঙবন্ধু হত্যার প্রায় দু-দশক পর মানুষ আবার অনুভব করেছে শেখ মুজিব কী ছিলেন। কেন তিনি ‘বঙবন্ধু’ উপাধি পেরেছিলেন। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, তিনি বাঙালিকে বড় করতে চেয়েছিলেন, আর মানুষকে বড় করার একটি পথ নির্দ্রিত মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। তাঁর হত্যার পর কতদল ও কতজন শাসন করলো বাংলাদেশ কিন্তু মানুষের মন থেকেতো তাঁকে মোছা গেল না, যে চেষ্টা এখনো অব্যাহত। কারণ, আজ আমরা দেখছি, আমরা একবারই সে মর্যাদা পেয়েছিলাম, সে পথ একবারই উন্মুক্ত হয়েছিল আমাদের জন্য ১৯৭১ সালে, যখন শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন নির্দ্রিত বাঙালির নেতৃত্বে আমরা সব ধরনের সশ্রদ্ধের হাটিয়ে দিয়েছিলাম।

বঙবন্ধু শেখ মুজিবের শত ক্রটি, শত সমালোচনা সন্তোষ আমাদের বলতে হবে, যা লিখেছেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরোধী মওদুদ আহমদ- “শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তর ঘটেছে বা ঘটেবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।” আজীবন তিনি বাঙালির স্বার্থে কাজ করেছেন এবং লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপস করেননি, যে কারণে বাঙালি ভালবেসে তাঁর নাম দিয়েছে ‘বঙবন্ধু’, আবেগে ‘জাতির পিতা’।

আবহমান সাধারণ বাঙালির মতোই ছিল তাঁর জীবনচর্যা, যে কারণে সব সময় তাঁর যোগ ছিল প্রবল ‘সাধারণ মানুষ, সম্প্রদায়ের সঙ্গে। যতই তিনি পরিবৃত হয়েছেন চাটুকার ও স্বার্থস্বীদের দ্বারা, ততই এই সূত্র ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। সাধারণ বাঙালির সব বৈশিষ্ট্যই তিনি ধারণ করেছিলেন, কিন্তু অসাধারণ ছিল তার মানুষ ও দেশের প্রতি ভালবাসা, যা ছিল অঙ্ক। বলতেন তিনি, ‘আমার শক্তি এই যে, আমি মানুষকে ভালোবাসি। আমার দুর্বলতা এই যে, আমি তাদের খুব ভালোবাসি।’

যখন তিনি রাষ্ট্রপতি হন, ‘বাকশাল’ গঠন করেন, তখনও কিন্তু এই ধারণাই তাঁর মনে কাজ করেছে যে তিনি দেশের স্বার্থে, জনের স্বার্থে কাজ করছেন।

প্রাক-১৯৭১ এবং ১৯৭১-৭৫ এর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে

বাংলাদেশের সিভিল সমাজে শেখ মুজিবের অবস্থা কোথায় আর অন্যান্য কারকদের অবস্থান কোথায়। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রাক ও উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। এ শতাব্দীতে দু-জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম বাঙালির জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলা ভাষাকে রূপ দিয়েছিলেন, যাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত; অন্যজন বাঙালির অনেক বছরের স্মপ্তকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন, সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন এ জাতির জন্য স্বাধীন এক ভূখণ্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। এ জন্য আমি গর্বিত, আমার উত্তরসূরিও হবে গর্বিত। বাঙালি ও বাংলাদেশ নামটাই বেঁচে থাকবে সে জন্য। আর এ কারণেই অনন্দাশংকর রায় লিখেছিলেন-

‘যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা বহমান।

ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।’

### সহায়ক অস্তু

- আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব, ঢাকা  
 হারমন-অর-রশিদ, বাঙালির রাষ্ট্র চিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তর, ঢাকা, ২০০৩  
 মুনতাসীর মামুন, বঙবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন, ঢাকা, ২০১৩  
 মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন (দুই খণ্ড), ঢাকা  
 মুনতাসীর মামুন, পাকিস্তানী জেনারেলদের মন, ঢাকা, ২০১০  
 মুনতাসীর মামুন, মৃত্যুক ১৯৭১, ঢাকা, ২০১০  
 মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) মৃত্যুক কোষ, ১২ খণ্ড, ঢাকা, ২০১৩  
 মুনতাসীর মামুন শান্তিকমিটি ১৯৭১, ঢাকা ২০১১  
 মুনতাসীর মামুন, আলবদর ১৯৭১, ঢাকা, ২০১২  
 মুনতাসীর মামুন, বীরামনা ১৯৭১, ঢাকা, ২০১২।